আমরা কোথায় চলেছি?
সঞ্জয়

আমরা
কোথায়
চলেছি?

আমরা কোথায় চলেছি ?

সঞ্জয়

গ্রন্থপ্রকাশ
৫-১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ঃ ভাদ্র, ১৩৬৯

প্রকাশক ঃ ময়ূখ বসু
গ্রন্থপ্রকাশ
৫-১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মুদ্রক ঃ রাখাল চট্টোপাধ্যায়
নিউ প্রিন্ট হাউস
২১, মহাত্মা-গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট ঃ শচীন বিশ্বাস

চার টাকা

গ্রন্থ-স্বত্বাধিকারী আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাইভেট লিমিটেডের সৌজন্যে
গ্রন্থপ্রকাশ কর্তৃক প্রকাশিত।

উৎসর্গ

নিজের কথা ছাড়াও যাঁরা

আজও স্বদেশের স্বসমাজের কথা ভাবেন

তাঁদের হাতে।

ভূমিকা

জিজ্ঞাসাটা প্রথম শোনা গিয়েছিল এই কলকাতারই এক বিচারকক্ষে। অবিশ্বাস্য প্রকৃতির সেই মোকদ্দমাটির রায় দিতে দিতে বিচারক বলেছিলেন—এবার বোধ হয় সময় এসেছে একটু থমকে দাঁড়িয়ে একবার ভাববার—কোথায় চলেছি আমরা ?

প্রকাণ্ড সেই জিজ্ঞাসা-চিহ্নটিকে সামনে রেখেই শুরু হয়েছিল দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র পৃষ্ঠায় তার উত্তর-সন্ধান। এই বই তারই ফল। এর রচনাকাল ১৯৬১-৬২ খ্রীস্টাব্দ, এবং লক্ষ্য আমাদের সমগ্র সমাজ হলেও এখানে আবার বলা আবশ্যক, এটি লেখা হয়েছে বাংলার রাজধানী-শহর কলকাতায় বসে।

আমরা কোথায় চলেছি ?

স্বামীর ফাঁসি হয়ে গেল। সেইসঙ্গে তাঁর এক মাসতুত না পিসতুত ভাইয়েরও। অপরাধ ঃ স্ত্রী-হত্যা।

* * *

বার মাস কারাবাস। অপরাধ ঃ অন্য মেয়ের শ্লীলতাহানিতে স্বামীকে সাহায্য।

* * *

বাবা এবং তস্য বন্ধু অভিযুক্ত। অপরাধ ঃ পাবলিক পার্কে (নিজ) মেয়ের দেহ বিক্রি।

* * *

পাঁচ বছর সশ্রম কারাবাস। অপরাধ ঃ বিবাহিতা তরুণী অপহরণ।

* * *

বিচার হয়ে গেল। অভিযোগ ছিল ঃ মিথ্যে বিয়ে।

* * *

বিচার হয়ে গেল। অভিযোগ ছিল ঃ ক্লাব খুলে ওরা পথচারী মেয়েদের অপমান করত।

* * *

বিচার হয়ে গেল। অভিযোগ ছিল ঃ মালা-বদলের কাহিনীটি ইচ্ছে করে গোপন করা হয়েছিল।

* * *

বিচার চলেছে। অভিযোগ ঃ চটের থলিতে যুবতী মেয়ের খণ্ডিত দেহ পাওয়া গেছে।

* * *

বিচার চলেছে। অভিযোগঃ জন-পথে একটি সদ্যোজাত মানবশিশু পাওয়া গেছে।

* * *

বিচার চলেছে। অভিযোগঃ বিহারের কোন গাঁয়ে গুদের ঘর থেকে তিনটি বাঙ্গালী মেয়েকে উদ্ধার করা হয়েছে।

* * *

বিচার চলেছে। অভিযোগঃ মামা নিজের ভাগ্নীর নারীত্বের চরম অমর্যাদা করেছেন।

* * *

বিচার চলেছে। অভিযোগঃ বাবা মেয়েদের বিশেষ বিশেষ লোকদের কাছে 'নাইস' হতে বলতেন।

* * *

খবরের কাগজের পাতায় প্রতিদিন এমন অনেক খবর বের হয়, যেগুলো শুধু সংবাদ নয়—ভাববার বিষয়। 'আইন-আদালত' স্তম্ভ প্রতিদিন পড়ে থাকি আমরা, কিন্তু একদিনও ভেবেছি কি—আমরা কোথায় চলেছি!

'হরিদ্রাবর্ণ' নামে কথিত কোন মার্কিনী কাগজ থেকে টুকে নেওয়া নয়, কোন বিলিতি সেনসেশ্যানাল জার্নলের শিরোনামা-সমূহের বঙ্গানুবাদও নয়,—এ দেশেরই খবর। বাংলা দেশের,—আমাদের ঘরের।

খবরগুলো জোগাড় করা হয়েছে থানায় ঘুরে ঘুরে নয়, আদালতের বন্ধ দুয়ারে আড়ি পেতেও নয়;—প্রতিদিন ভোরে জানালা দিয়ে কাগজওয়ালা ছুঁড়ে দিয়ে যায় যে খবরের কাগজটি তারই পাতা থেকে। 'আইন-আদালত' স্তম্ভের নীচে যে কালো ছায়ার বৃত্তটি—সেখান থেকে। উল্লেখযোগ্য ঃ যদিচ হরফগুলো অত্যন্ত কালো,

তবুও খবরগুলো সকলের চেনা। এমন কি অনুমান করি আমার দশম বর্ষীয়া কন্যাটির পর্যন্ত। কেননা, শুধু প্রতিবেশীর ঘরের খবর নয়, খবরগুলো ছাপাও বাংলা ভাষায়,—আমাদের মাতৃভাষায়। আরও উল্লেখযোগ্য এ খবর সম্বৎসরের খতিয়ান নয়, আমাদের আজকের মাতৃভূমির মাত্র কয়েক সপ্তাহের ফসল। তাও সম্পূর্ণ নয়,—আংশিক!

খবরের কাগজে যা যা ছাপা হয়েছিল তার সব যেমন এখানে লেখা হয়নি, তেমনি জানিয়ে রাখা ভাল, আদালতে যা যা শোনা যায় খবরের কাগজে তার সব ছাপা হয় না। এবং পুলিসের ডায়েরীতে যা লেখা হয় শেষ পর্যন্ত সব তার আদালত অবধি পৌঁছায় না।

পুলিসের অনুমান—খুন, রাহাজানি গোপন থাকে না বটে, কিন্তু ঘটনা যেখানে ভদ্রঘরের মেয়েদের নিয়ে সেখানে তাঁরা যতটুকু খবর পান সে সমগ্রের পাঁচ ভাগের একভাগ মাত্র। অর্থাৎ, একশ'টি মেয়ে যখন অপহৃত হন তখন তাঁদের কানে আসে মাত্র কুড়িজনের কথা। ঘটনা যদি অপহরণের চেয়েও 'কলঙ্কর' কিছু হয় তবে মাত্র পাঁচ জনের কথা! অথচ, বাকী পঁচানব্বুইজনকে বাদ দিয়েও আজ লালবাজারের হাতে মস্ত খাতা। সে খাতায় শত শত কালো পাতা।

তাতে লেখা আছে গেল বছর (১৯৬০) পশ্চিম বাংলায় ৪৫০টি খুন হয়েছে, তার মধ্যে শুধু কলকাতায় ৩৫টি! গোটা পশ্চিম বাংলায় ঐ বছর নারীহরণের ঘটনা ঘটেছে ৮০০টি, তার মধ্যে কলকাতায়—২০০টি! বলা বাহুল্য ভগ্নাংশ যদি এই হয় তবে সমগ্র বৃত্তটি আইন-আদালত স্তম্ভের নীচে যতখানি দেখা যায় তার চেয়ে বড়।—অনেক, অনেকগুণ বড়। যদি চোখ মেলে তাকান, তবে দেখবেন, আমাদের সমগ্র জন্মভূমি সেই কালো রেখার অন্তর্গত। গোটা বাংলা দেশ সেই কৃষ্ণচ্ছায়া কবলিত।

অনেক উদাহরণ দেব না। পুলিস জিভ কেটে কানে কানে কাদের সম্বন্ধে কি বলে সে কথা বলব না, লেক-এর পাশে অন্ধকার গাড়ীটাতে কি দেখা গিয়েছিল সে কথাও না। শুধু দু'একটা সে জাতীয় কাহিনীই বলছি যা ওরা নিজেরা প্রকাশ্যে বলেছিল।

মাস কয়েক আগের ঘটনা। দুপুর। কালীঘাট থেকে চৌরঙ্গী আসছি। চলমান ফাঁকা ট্রাম। হঠাৎ কে যেন জানালা দিয়ে কি একটা কাগজ হাতে গুঁজে দিয়ে গেল। ভেবেছিলাম কোন হেকিম কিংবা জ্যোতিষীর বিজ্ঞাপন। কিন্তু খুলে দেখা গেল, কারবন কপিতে বহুধা করে প্রচারিত কাগজটি আসলে একটি গৃহস্থ-কন্যার জীবন।

মেয়েটি মা বাবার সঙ্গে কাছাকাছি একটি গলিতে ছিল। এখন নেই। ওর বাবাও নেই। কেন নেই তারই কুৎসিত বিবরণ পরিবেশিত হয়েছে কাগজটিতে। শেষে 'জনসাধারণের কাছে' আবেদন করা হচ্ছে—কেউ যেন না ঠকেন, এ মেয়েকে কেউ যেন বিয়ে না করেন! জানিনা সেই হতভাগিনীর বিয়ে হয়েছে কিনা। শুধু এটুকুই জানি তার স্কুলশিক্ষক বাবা মেয়েকে নিয়ে পাড়া ছেড়ে পালিয়ে গিয়েও ছাড়া পাননি। পেছনে কর্দম হাতে লোকেরা ছুটে বেড়াচ্ছে। ট্রাজেডি সেখানেই। একটি মেয়েকে নিয়ে (হোক না সে অপরাধিনী) দেশ উবু হয়ে হ্যাণ্ডবিল লিখতে বসেছে। যা ছিল (বা হতে পারত) কোন বিশেষ কুলে একবিন্দু কলঙ্ক তা কি তবে আজ অমাবস্যা হয়ে গোটা দেশকে ঘিরে ধরেছে ?

সন্দেহ হয়। কেন হয়, সে কথাই বলছি। মাত্র ক'দিন আগের কথা। কলকাতারই একটি গলিতে লাল কালিতে লেখা একটি প্রাচীরপত্র চোখে পড়েছিল। প্রকাশ্য রাস্তায় স্পষ্ট অক্ষরে এমন কৃষ্ণবর্ণ বাক্য আমি জীবনে আর পড়িনি। কোন দিন পড়তে হবে তাও ভাবিনি। বহু চোলাই এবং ধোলাই অন্তে তার মর্ম ঃ অমুক নম্বর বাড়ীর অমুক নামের যে মেয়েটি তার কথা কি জানেন ?—জানেন কি সে— ? জানেন কি সে— ?

সত্যিই জানতাম না, আমরা এতখানি নেমেছি। প্রতিবেশীর ঘরের খবরকে দেওয়ালের বিষয়বস্তু করে তুলেছি! থেকে থেকে তাই মনে হয়, 'আইন-আদালত' যা বলতে চায় সে কথা সত্য নয়; দেশে খণ্ডগ্রাস নয়,—পূর্ণগ্রাস গ্রহণ!

প্রশ্ন : কেন এমন হচ্ছে? স্বাধীনতা নামক এমন প্রবল সূর্যোদয়ের পরেও দেশে কেন এমন থমথমে আঁধার নেমে এসেছে?

উত্তরটা খবরগুলোর মধ্যেই কিছু কিছু আছে। বেলঘরিয়া থেকে বেলেঘাটার পার্ক অবধি যে-বাবা নিজের মেয়েকে নিয়ে আসেন তাঁর জন্যে শুধু জজসাহেব কাঁদলেই বোধহয় জাতির কলঙ্ক মোচন হয় না! যে-স্বামী ভাত না দিতে পেরে নিজের হাতে স্ত্রীকে গলা টিপে মারল তার জন্যে খবরের কাগজে নরম কলমে লিখলেই বোধহয় আমাদের পাপ-ক্ষালন হয় না! মনে রাখতে হবে, দারিদ্র্য বাস্তুহারার পক্ষেও একক দায়িত্ব নয় এবং সে পাপ চোখের ওপর রুমাল বুলিয়ে মুছে নেওয়ার মত তত জলো বস্তু নয়!

দ্বিতীয়ত, দারিদ্র্য শুধু আমাদের আর্থিক নয়, নানাবিধ। একঘরে স্বামী-স্ত্রী, বয়স্ক আত্মীয়, পর্দার ওপারে—বয়স্কা অনাত্মীয়। ফলে কয়েক লক্ষ মানুষের নগরে যে দু'শ মেয়ে হারিয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা যে সবাই অপহৃতা হয়েছিলেন এমন কথা বলা যায় না। এমন কি সম্ভবত মামার অপরাধটুকুও যেন অস্বাভাবিক বলে ভাবা যায় না। কেননা, যখন কোথাও কিছুই থাকে না, ঘরে ভাত থাকে না, দিনের শেষে একটু মাথা গুঁজে শোয়ার জায়গা থাকে না, কর্মজীবনে নির্ভরতা থাকে না, সমাজে শাসন থাকে না, দেশে নীতি থাকে না—তখন বাবা, মামা—আমি আপনি কারও কাছেই কোন কিছু আর 'অস্বাভাবিক' বলে থাকে না। সমগ্র দেশকে তমসাচ্ছন্ন রেখে আমরা শুধু ক'টি অসহায় তরুণীর (বিবেচনাশীলও) কাছে সীতা এবং সাবিত্রীর ভূমিকায় ঠায় দাঁড়িয়ে নির্দেশ-জারি করতে পারি না!

প্রশ্ন উঠতে পারে, অর্থহীনতাই যদি আজকের এই সামাজিক অনর্থের একমাত্র কারণ হয়, তবে সেই সংবাদগুলোর ব্যাখ্যা কি, নায়কের রোজগার যেখানে মাসিক দু'হাজার টাকা কিংবা নায়িকা বাড়ী, গাড়ী এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি মিলিয়ে ছিলেন যথার্থই রাজমহিষী!

নিছক ব্যক্তিগত কারণবশত যেসব ঘটনা তার কথা স্বতন্ত্র। সে রাজবাড়ীতেও যেমন হয়, তেমনি হতে পারে ফুটপাথবাসী গৃহস্থের অন্দরেও। কিন্তু তাদের কথা বাদ দিলেও, আইন-আদালতের স্তম্ভে সত্যিই আজ এমন মানুষের অহরহ দেখা মিলছে যাঁরা নিশ্চয়ই স্থূলার্থে অভাবক্লিষ্ট নন! তবে কেন তাঁরা সে পথে গেলেন? উত্তর: বিশেষ বিশেষ অপরাধের ক্ষেত্রে নাকি তাই নিয়ম; সেগুলো স্বাস্থ্যের লক্ষণ। প্রমাণ আজকের ইউরোপ, আজকের আমেরিকা।

সেখানে সম্পদ বেড়েছে। খাওয়াপরা বিষয়ে জনতার দৈন্য ঘুচেছে, সুতরাং লুটপাট রাহাজানি কমেছে কিন্তু খুন বেড়েছে, ভাঙ্গা-হৃদয় এবং ভাঙ্গা-সংসারের সংখ্যা বেড়েছে এবং বেড়েছে নারীঘটিত অপরাধের পরিমাণও। কেননা, হাতে অর্থ এবং সামর্থ আছে। এবং দেখে-শুনে জানা গেছে—জগৎ অনিত্য।

মনে হয়, আমরাও যেন আজ সেই বড়মানুষির কবলে। যুদ্ধ, দেশবিভাগ, সহসা স্বাধীনতা, পর পর তিনটি পাঁচসালা-অন্তে সহসা কিছু কিছু মানুষ যেন এ দেশেও জেনে গিয়েছে সমাজ সংসার, গ্রহ তারা এসব বোগাস, মিথ্যা। আসলে সত্য ওই নিওনের আলো!

মনে রাখতে হবে, বাইরে অগণিত স্থবির জীবনের ডোবা খন্দ আছে বলেই—এ আলোতে পুড়ে মরার মত পতঙ্গ পাওয়া যাচ্ছে। কেনবার লোক আছে বলেই বাংলা দেশের উদ্বাস্তু-কন্যাকে কেড়ে দেওঘর অবধি বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।...

কখনও স্বেচ্ছায় ধাওয়া, কখনও আলোর হাতছানি, নিমন্ত্রণ,

কখনও অতর্কিত আক্রমণ, 'আইন-আদালত' প্রতিদিন সেই তমসার কাহিনী লিখে যাচ্ছে, দেশ মনোযোগ সহকারে পড়ছে। কিন্তু সন্তানেরা ভাবছে কি তাদের মাতৃভূমি, স্বদেশ—কোথায় চলেছে! আমরা কোথায় চলেছি!

ভেজাল

"আবশ্যক। সরিষার তৈলে উত্তমরূপে ভেজাল মিশাইতে পারেন এমন কয়েকজন সুদক্ষ কর্মী আবশ্যক। বেতন যোগ্যতা অনুযায়ী। সত্বর আবেদন করুন। পোস্ট বক্স..."

খুব বেশীদিন আগের কথা নয়, কলকাতারই একটি দৈনিকপত্রে একবার উপরোক্ত মর্মে কয়েকটি লাইন ছাপা হয়েছিল। তবে 'কর্মখালি' স্তম্ভে নয়, একটি লঘুগুরু কলমে। শোনা যায়, ছাপা হওয়ার পর অনেকগুলো খাম এবং পোস্টকার্ড এসেছিল সম্পাদকের দপ্তরে। কিন্তু একটিও তার এই মর্মভেদী ব্যঙ্গবাণটির জন্যে পাঠকের অভিনন্দন-পত্র নয়, সবক'টি ছিল চাকরির দরখাস্ত।

বলা বাহুল্য, তারপর আর আমরা কোথায় চলেছি জানতে চাওয়ার কোন অর্থ হয় না। বরং কোথায় আছি, এবারে বোধহয় তাই ভাববার সময়। জানিনা, সে সময় এখনও আছে কিনা!

ইংরেজীতে একটা সাবেকী ছড়া আছে। তার মর্ম ঃ বিন্দু বিন্দু জলে শুধু সমুদ্র হয় না, গয়লার মেয়ের সিল্কের গাউনও হয়। আমাদের দেশে গয়লা-বৌ এখনও ময়লা কাপড় পরে। সুতরাং, জলের বদলে মাটির তলায় তাদের কি জমেছে বা জমতে পারে সেসব কথা এখানে তুলব না। লোকে তাহলে পরশ্রীকাতর বলবে। তার চেয়ে বরং নিজেদের কথাই বলি। গয়লা, মুদি, ওষুধওয়ালা,

খাবারওয়ালা ইত্যাদি জনতার উপরওয়ালাদের বিন্দু বিন্দু অবদানে আজ এদেশে যে মহাসমুদ্রটি রচিত হয়েছে তার কথা।

গোটা সাগর গরল। সুতরাং ঘটা করে মন্থন নিষ্প্রয়োজন। মনে মনে একবার শুধু পেছনে তাকান, দেখবেন ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত সেই খবরগুলো এখনও চোখে ভাসছে।

সেবার হঠাৎ শোনা গেল, বাজারে যে পেনিসেলিন চলছে তা জাল। পেনিসেলিনও জাল হতে পারে আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং তা নিশ্চয় স্বপ্নেও ভাবেননি। কিন্তু বিদেশী প্রস্তুতকারী অনুসন্ধানান্তে জানালেন এই সনাতন দেশে সবই হতে পারে।

হয়ও। মাঝে মাঝেই কাগজে ছবি দেখা যায়, বেলগাছিয়া কি কাঁকুড়গাছির বস্তিতে বড়ি তৈরীর মেশিন চলেছে। লোকেরা আটা ময়দা এবং চকখড়ি দিয়ে ওষুধের কুটিরশিল্প গড়ে তুলেছে। (—হায়, না জানি এখনও কত ধরা পড়েনি !)

অন্ধকারে যাদের বেসাতি শুধু তাদেরই হাতে নয়, আলোতেও যে এ খেলা চলে এই দেশে তারও নজীর আছে।

মনে আছে নিশ্চয়, একটি বার্লি কোম্পানি ক'বছর আগে কিছু জরিমানা দিয়েছিল।—অপরাধ ? অপরাধ 'শিশু এবং রোগীর পুষ্টিকর খাদ্য' হিসেবে বিক্রীত ওদের কৌটোগুলোতে ভেজাল পাওয়া গিয়েছিল। অর্থাৎ যে কৌটোয় প্রাণভ্রমরা থাকবার কথা, সেখানে মৃত্যু ছিল।

অজ্ঞাত উদাহরণ নিশ্চয় আরও আছে। (কোন কৌটোর পেটে পেটে কি আছে কে জানে !) ক'মাস আগে খবরের কাগজের মুখে আর একটি নমুনা জ্ঞাত হয়েছিলাম। সে খবরটির মর্ম ঃ ভারত-সরকার অমুক নামের একটি বিখ্যাত ওষুধ কোম্পানীকে মন্দ বলেছেন। কারণ, তাঁরা পরীক্ষা করে দেখেছেন ওদের তৈরী অধিকাংশ ওষুধই 'সাব স্ট্যাণ্ডার্ড'। অর্থাৎ, তাতে যে বস্তু যে পরিমাণে থাকা উচিত সে বস্তু সে পরিমাণে নেই।

নেই আমাদেরও। জাতি হিসেবে আমাদের যা যা থাকা দরকার ছিল, আর সব জাতির যা থাকে—নিশ্চয় আমাদের আজ আর তা নেই। যদি থাকত তাহলে উপরের যে কোন একটি সংবাদ উপলক্ষ্যে এদেশে ভূমিকম্প হতে পারত (—আহা, ভূমিকম্প শুধু 'অস্পৃশ্যতা' পাপেই হয় কেন?) এবং সেই প্রলয়ের শেষে স্বাধীনতার পনেরো বছর পরে এজাতীয় খবর নিশ্চয় আমাদের আর পড়তে হত না।

আজ তা হচ্ছে, কারণ যাকে বলে 'চরিত্র' আমাদের সেটি নেই। নেই বলেই, দু'পয়সায় বিক্রিকরা পুরানো ওষুধের শিশি আবার গায়ে মোড়ক চাপিয়ে দশ টাকা নজরানা নিয়ে ঘরে ফিরছে,—ডাক্তারকে বেয়াকুফ করে, আত্মীয়-বন্ধুদের ভাগ্যের কথা শুনিয়ে—রোগীর জীবন কেড়ে নিয়ে হাসতে হাসতে সরে যাচ্ছে।

অথচ আশ্চর্য এই, এদেশে তেত্রিশকোটি দেবতা আছেন (তাঁদের প্রত্যেকেই কমবেশী দুষ্টের শাসক এবং ভক্তের রক্ষক), পুলিস আছে, এবং অভিভাবকস্বরূপ আছেন একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সরকার! কিন্তু 'ভেজাল' তবুও এদেশে নব নব চমকের ব্যাপার! অথচ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই, সরকারের হাতে এই পাপ নিরূপণার্থে স্ট্যাণ্ডার্ড ইনস্টিটিউট নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে এবং ভেজাল নিরোধক আইন (১৯৫৪) নামে একটি আইনও আছে।

স্ট্যাণ্ডার্ড ইনস্টিটিউট বা ভারতীয় মানকসংস্থা নামক প্রতিষ্ঠানটি অনেকটা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মত। তাঁরা কেবলমাত্র ভক্তদের মধ্যেই শুধু 'আগমার্ক' নামক রাজটিকা বিতরণ করে থাকেন। যাঁরা স্বেচ্ছায় এবং স্বখরচায় তাঁদের কাছে ধরা দেন না তাঁরা কখনই সেসব প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে মাথা ঘামান না। ফলে, বলা বাহুল্য, দেশের শতকরা ৯৯.৯টি প্রতিষ্ঠানই তাঁদের ধার ধারেন

না। যদি ধারতেন তবে নিশ্চয় নিম্নলিখিত ভেষজবিজ্ঞানটি 'সত্যমেব জয়তে'র সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এমন তালে এদেশে চলত না।

সংক্ষেপে নিজের ভাষায় উত্তর লিখ :—মাখনে কি কি…'

ভেজাল কাকে বলে কিংবা কিসে কি ভেজাল চলে তার একটা দেশাচারসম্মত ফর্দ আমাদের দেশের যাবতীয় স্কুলপাঠ্য স্বাস্থ্য এবং গার্হস্থ্য-বিজ্ঞানের বইগুলোতে দেওয়া আছে। (—হা ঈশ্বর, এর চেয়ে তুমি কেন আমাদের হাত থেকে বিজ্ঞানের বই কেড়ে নিলে না!) 'ভাল' ছেলে-মেয়ে মাত্রেরই তা কণ্ঠস্থ। কিন্তু তারা জানে না, এমন দেশে তারা জন্মেছে যেখানে ভাল নম্বর পেতে হলে ফর্দটাকে প্রতিদিন নতুন করে লেখা চাই।

সব সবিস্তারে এখানে লেখা সম্ভব নয়। স্বাস্থ্য বই যাঁরা লেখেন এবং তা পড়ে যারা নম্বর অর্জন করে (কে জানে, ভবিষ্যতে অর্থও হয়ত অর্জিত হয়!) তাদের অবগতির জন্যে সংক্ষেপে কয়েকটা সংবাদই এখানে উল্লেখ করছি। আশারাখি, ভারতের উদ্ভাবনী শক্তির প্রমাণ হিসেবে এটুকুই আপাতত যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে।

জিরা—মেশিনে কাঠ থেকে সাঁচে জিরা তৈরী হয়।

দারুচিনি—চিনির রসে জ্বাল দেওয়া যে কোন গাছের ছাল।

চা—কাঠের গুঁড়ো, চামড়ার গুঁড়ো; সুবিধেমত যে কোন গাছের পাতার কুচি কিংবা যা খুশী!

রাবড়ি—বাঁধাকপির পাতা সেদ্ধ, কিংবা ব্লটিং পেপার।

হলুদ—সিসা এবং নানাবিধ কেমিক্যাল জিনিস।

ময়দা—সোপস্টোন চকখড়ি, বুনো বীজের গুঁড়ো কিংবা পরিষ্কার ধূলো!

যেসব ভেজাল এখনও শোনা যায়নি তার মধ্যে আছে প্ল্যাস্টিকের মেথি, ন্যাকড়ার মাছ বা স্প্রীংয়ের দুগ্ধবতী গরু। তাই বলে নিশ্চিত হওয়ার কিছু নেই কারণ ইতিমধ্যেই যেসব হয়েছে

বলে শোনা গেছে তার মধ্যে আছে পুকুরের ইলিশ, ভেজাল সোনার স্বর্ণ-পদক এবং রঙ্গীন পটল!

"মেড ইন ইনল্যাণ্ড!"

লজ্জাকর ইতিবৃত্তের এখানেই ইতি নয়। স্বাধীন ভারতের জাতীয় চরিত্রের পরিচয়স্বরূপ গেল ক'বছরে সোনার জলে নিজেদের স্বাক্ষরাঙ্কিত বিস্তর কল-কব্জা, ছাতা, কলম, থার্মোমিটার আমরা বাজারে ছেড়েছি। তাদের কোনটির গায়ে লেখা 'মেড এজ ইংল্যাণ্ড', কোনটির—'মেড ইন ইনল্যাণ্ড', কোনটির বা—'পার্টস মেড ইন ইংল্যাণ্ড!' বলা নিষ্প্রয়োজন—প্রতিটি ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট তুর্বল জায়গাগুলো ছোট এবং অস্পষ্ট হরফে মুদ্রিত! অথচ, মজার বিষয় আইনে সহসা তাদের ধরার উপায় নেই। কেননা, এ ত আর মিথ্যে নয়। তাছাড়া, কেনা জানে মহাভারতের যুগ থেকেই এ মিথ্যা এদেশে জল-চল। তবে হ্যাঁ, ধর্মত চালান চাই। যদি মনে অন্য দেশের প্রশংসা করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকে তবে বড়বাজারে তৈরী কলম যতখুশী চৌরঙ্গীতে—'আমরিকান মাল'…'আমরিকান মাল' বলে চালাও।

ভয় নেই, কেউ কিছু বলবে না। আইন আছে বটে, কিন্তু সে আইন কাজে লাগাবার জন্যে কেউ নেই।

চালুনি বলে ছুঁচ—

কলকাতা কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের হাতে এ শহরের খাদ্যাদি পরীক্ষার্থে লোক আছে তিরিশ জন। তাছাড়া আছে—সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগ এবং পুলিসের এনফোর্সমেণ্ট বিভাগ। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কলকাতা আজও ভেজালের এক বিচিত্র ভৈষজ্যালয়।

কর্পোরেশনের ছিদ্রান্বেষীদের মতে তার প্রধান কারণ সরকারী আইনে ত্রুটি।

প্রথমত, তাঁরা বলেন—'৫৪ সালের আইন অনুযায়ী রেল-স্টেশনে, বন্দরে বা অন্য রাজ্যের সীমানায় গিয়ে তাদের নমুনা

সংগ্রহের অধিকার নেই। দ্বিতীয়ত, ব্যবসা কলকাতায় হলেও গুদাম যদি মিউনিসিপাল এলাকার বাইরে হয় তবে সেখানে গিয়েও তাদের কোন জিনিস চেখে দেখবার অধিকার নেই। তাছাড়া, তাঁরা আরও বলেন—ভেজালকারীকে ধরার পর পাবলিককে পাশে পাওয়া যায় না, তারা সাক্ষী হতে চায় না। কোর্টে যাওয়ার পর সময়মত বিচার হয় না। কেননা, মোকদ্দমা যত সে তুলনায় সেখানে তত বিচারক নেই।

'ভেজাল খাবারের নমুনা কোথায় ?'

অভিযোগগুলো সত্য হলে অবশ্যই বিবেচ্য। তবে সেই সঙ্গে কলকাতা কর্পোরেশন তার নিজের এলাকায় কি করেছে সেটুকুও নিশ্চয় শোনবার মত।

আইনটা যদিচ সংশোধিত হয়ে পাশ হয়েছিল '৫৪ সালে—শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, কর্পোরেশন বলতে গেলে কাজে নেমেছে এই সেদিন, ১৯৫৯ সালের ৪ঠা আগস্ট। প্রায় চার বছর সময় লেগেছিল তাদের কেবল মাত্র সাজ-পোশাক পরতে।

১৯৫৯ সালের আগস্ট থেকে '৬১ সালের জুন পর্যন্ত বিস্তর তেল পুড়িয়ে, মাইনে পিটিয়ে এবং কাগজের অপব্যয় করে তাঁরা নমুনা সংগ্রহ করেছেন কত জানেন—৫৩২৬টি (লোকে বলে,—এটুকু ত ঐ লালবাড়িটা থেকে একদিনেই জোগাড় করা যায়।) তার মধ্যে পরখ করা হয়েছে—৫১৯৬টি। অভিযোগ দায়ের হয়েছে ১৫৬২টি। বিচার হয়েছে—মাত্র ৫৭৪টির! তার মধ্যে অধিকাংশেরই দিতে হয়েছে জরিমানা, জেল খেটেছে মাত্র কয়েকজন। তবে সকলেরই মেয়াদ তিন মাসের মধ্যে!

প্রশ্ন উঠতে পারে অপরাধ যেখানে 'খাদ্যে ভেজাল', সেখানে সাজা এত কম কেন? উত্তরে মনে পড়ছে '৫৯ সালে উত্থাপিত একটি মোকদ্দমার কথা। মামলাটি ছিল একটি ময়দা কলের বিরুদ্ধে।

ওঁরা স্বীকার করলেন—বস্তুটা খাদ্য হিসেবে সত্যিই অখাদ্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মেমো বের করে পাইকারের নামটি দেখালেন। কর্পোরেশন চোখ কপালে তুলে দেখলেন—জিনিসটির বিক্রেতা স্বয়ং সরকার!

সুতরাং, তিন বছর ধরে আইনের মারপ্যাঁচ চলল এবং পাবলিক 'যা হক তবু খেতে পাচ্ছি' ভেবে সানন্দে সে ময়দার লুচি ভেজে খেয়ে গেল।

কেননা, তার মনেও ধন্ধ আছে যে টাকার জিনিসগুলো তার সবটুকু সমান সাচ্চা কিনা।

আমাদের নওজোয়ানেরা

॥ এক ॥

স্থান—কলকাতারই একটি গলিপথ।

কাল—রাত প্রায় দশটা।

গলিতে সেদিন আলো নেই। প্রায়ই থাকে না। কিন্তু পা দেওয়া মাত্র মনে হল এমন অন্ধকারও বুঝি আর হয় না। বিবর্ণ বাড়িগুলো সার বেঁধে মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে আছে। নিচে, অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, 'পাড়ার ছেলে' নামে খ্যাত সতত খুশ-মেজাজী ছেলেগুলো এখানে-ওখানে মাথা নিচু করে বসে আছে। কানগুলো তাদের খরগোসের মত সতর্ক, চোখগুলো ঘুমের আগে বেড়ালের মত ভাবলগ্ন। সহসা দেখলে মনে হয়, যেন এইখানে, এই গলিটায় কিছুক্ষণ আগে এমন কিছু হয়ে গেছে যা পাড়ার পক্ষে ত বটেই, সমগ্র মানব-জাতির পক্ষে হৃদয়বিদারক; কিংবা এই মুহূর্তে এখানে এমন একটা কিছু ঘটনার সম্ভাবনা যা ওরা ছাড়া কেউ জানে না।—এমন কি ভাবতেও পারে না। প্রতিটি

ছেলের বসবার ভঙ্গিতে প্রস্তরীভূত উদ্বেগ। স্থানাভাব বশত যারা দাঁড়িয়ে আছে, উৎকণ্ঠা তাদের দাঁড়াবার ভঙ্গিতেও। চারদিক নিস্তব্ধ। শুধু দূরে কাদের বাড়ির তিনতলায় যেন একটা রেডিও পরিত্রাহি চিৎকার করছে।

আচমকা এমন পরিস্থিতিতে পড়লে যা হয়—ভয় হল। মনের মধ্যে এক সঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন ভিড় করে এল।—তবে কি? পাড়ার কোন অমঙ্গল?—কোন অ্যাক্সিডেন্ট? মারামারি—পুলিস? ...তারা সিং?—বিজার্তা?—বালিন?

আলোর মুখ দেখা মাত্র প্রশ্নগুলো ছিটকে মুখ থেকে বেরিয়ে এল। '—দূর, ওসব কিছু নয় স্যার' মোড় ঘুরতেই একটি ছেলে আমাকে সান্ত্বনা দিলে—'ন্যাশনাল প্রোগ্রামে আজ চিত্রাঙ্গদা আছে কিনা স্যার—'

কোথায় বার্লিন বিজার্তা, কোথায় 'চিত্রাঙ্গদা'! সেই অন্ধকার গলির তমসা যেন মুহূর্তে ছিন্ন হয়ে গেল; আমি আলো দেখলাম। জ্ঞানের আলো। আমরা কোথায় চলেছি, তারই দিগ্‌দর্শক আলো।

দিনের বেলায় অন্যতর আলো লাগে না। সাদা চোখেই দেখা যায়! এবং শুধু এগলিতে নয়। কলকাতার যে কোন গলিতে, যে কোন পথে—যে কোন মোড়ে। তিন রাস্তা, চার রাস্তা, পাঁচ রাস্তার মাথায়—যেখানে খুশি। কম পক্ষে পাঁচ পাঁচকে পঁচিশটা মাথা সেখানে সব সময় হাজির আছে। তবে দেখতে হলে সব চেয়ে ভাল যদি এই সময়টায় আসেন। মানে—সাড়ে-আটটা পৌনে-ন'টা থেকে দশটা সাড়ে-দশটার মধ্যে একবার।

দেখবেন, গলির মোড়ে মোড়ে, (পটভূমিকায় একটা চায়ের দোকান রেখে) ফুটপাথে এবং এখানে-ওখানে পাতাবাহারে সাজানো তোড়ার মত দাঁড়িয়ে আছে গোছা গোছা রোমিওরা। তাদের নজর কারও অন্তর্মুখী (মানে, গলির ভেতরের দিকে) কিংবা ঊর্ধ্বলোকে (মানে, তিনতলার জানালায়) অথবা—সোজা সামনের দিকে।

বই হাতে মাথা নিচু করে গুটি গুটি পায়ে বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে এগিয়ে আসছে যে মেয়েটি তার দিকে।

সহচর এতক্ষণ অন্যদিকে তাকিয়ে ছিল। সে ভাবছিল—রোজ রোজ এমন লেট হয় তবু মাইরি চাকরি যায় না! এদিকে নজর পড়া মাত্র তার সে ভাবনায় ছেদ পড়ল। চিরুনিটা চট করে মাথার ওপর বার দুই চালিয়ে নিয়ে সে টান হয়ে দাঁড়াল। তারপর কলারটা কানের দিকে একটু টেনে নিচু গলায় বললে—'যাই বলিস তুই···লাকি মাইরি।···চামর আছে!'

বাস ছাড়ল। সবাই উঠল। সবার শেষে হঠাৎ ফুটপাথ থেকে ছুটে গিয়ে হ্যাণ্ডেলটা ধরে ঝুলে পড়ল সেই ছেলেটি। পেছন থেকে বন্ধু তার চেঁচাচ্ছে—'কি রে চললি যে! দেখিস আবার পেছনে ঘোচর না লাগে!'

এ ভাষা আপনি জানেন না। ওরা ছাড়া কেউ জানে না। যদি জানতেন তবে ঘরে বসে প্রতিদিন এমন অনেক শব্দের সঙ্গে পরিচিত হতেন যার প্রত্যেকটি শুধু অশ্রাব্য নয় যাদের প্রসঙ্গে তা উক্ত সামাজিক সম্পর্ক-সূত্রে এসব মুখে তা অভাবিতও। বিশেষ করে, প্রতিটি মুখই চেনা মুখ। এমনকি এদের বাবা-দাদাদের মুখগুলো পর্যন্ত। তাঁদের কেউ আপিসে কাজ করেন, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ সরকারী কর্মচারী। প্রতিবেশী হিসেবে কম-বেশী সবাই তাঁরা সজ্জন।

এরা কারা?

বয়স—সাত থেকে একুশ। মাতৃভাষা—বাংলা, হিন্দী, ইংরেজী। ধর্ম—হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খৃস্টান। জাতি—বাঙালী, বিহারী, অ্যাঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান, পাঞ্জাবী। ব্যবসা—লেখাপড়া, কিংবা বেকার।

পরিচয়ে সব দিক থেকে দেশের আর পাঁচজন সামাজিক মানুষের মত। কিন্তু তা হলেও দেশের মানুষের পরিচয়ে ওদের পরিচয় নয়।

আমেরিকায় ওদের বলা হয়—'বিদ্রোহী'। অবশ্য পুরো নামটি

আর একটু দীর্ঘ। যে সব বালক ঠিক বালকের মত নয়—তাঁরা তাদের নাম দিয়েছেন 'রেবেলস উইদাউট এ কজ'! মানে—'কারণহীন বীরবৃন্দ'!

ইংল্যাণ্ডে নাম তাদের—'টেডি বয়' (এডোয়ার্ডিয়ান পোশাক+রাউডিনেস=টেডি বয়েজ), জার্মানী এবং অস্ট্রিয়ায় 'হাল্‌বস্টারকেন, (Halbestarken) বা 'হাফ-স্ট্রং', সুইডেনে—'স্কিন্ন্‌ত' (Skinn-knuttee) বা 'লেদার-জ্যাকেট', ফ্রান্সে—'ব্লাউসনস নয়ের' (Blousonsnoir) বা 'ব্ল্যাক-জ্যাকেট', অস্ট্রেলিয়ায় 'উইজিস' (Widgies) কিংবা 'বজিস' (Bodgies), রাশিয়ায়—'স্টাইলাগি (Stilyagi) বা 'স্টাইল বয়েজ', জাপানে—'তাইয়োজোকু'(Taiyo-zoku) বা 'সূর্যের সন্তানেরা' এবং এবম্বিধ। কোথাও কোথাও আবার নাম তাদের—'সটসিস' (Tsotsis), কোথাও বা 'মাম্বো-বয়' (Mambo Boys)!—আর আমাদের দেশে জানেন নিশ্চয়, আমাদের দেশে পরিচয় তাদের 'পাড়ার ছেলে' কিংবা 'রক-ফেলার'। বলা নিষ্প্রয়োজন শেষের নামটি তাদের দেওয়া, দুর্ভাগ্য-বশতই বাড়িতে যাদের রোয়াক ছিল।

'রকফেলার'গণ

রকফেলারদের যে রোয়াকেই দেখা পাবেন এমন কোন কথা নেই। ভাল খেলা থাকলে জানবেন তারা বিনেটিকিটে ছাদ এবং ভিতসহ গোটা ট্রাম রিজার্ভ করে মাঠে গিয়েছে। আপাতত কেউ কেউ তাদের ডালে সুবিধাজনক পজিশন নেওয়ার চেষ্টায় আছে, কেউ কেউ সুযোগ খুঁজছে, অন্য রকফেলারদের সাজান ব্যূহ ভেদ করে লাইনে পেনিট্রেট করবার।

খেলা যদি তেমন জমজমাট না হয় তবে জানবেন, ওদের দুই দল গেছে দু'দিকে ম্যাটিনি শো দেখতে। পয়সা অবশ্য 'হিজ হিজ হুজ হুজ,' কিন্তু লাইনের সেই অংশটুকুর দিকে তাকালেই বুঝবেন দলটা পাড়ার।

বলতে গেলে—সকলের প্রায় এক পোশাক। পায়ে সকলেরই হাওয়াইন শ্লীপার, কিংবা ফিতেওয়ালা সু (সমোজা), গায়ে হংকঙ্গিপ হাওয়াইন শার্ট, (কলারটি তার শক্ত এবং রংটি সব সময় অরিজিনাল কালার।) পরনে—চাপা প্যান্ট অথবা পাজামা, মুখে সেই অপরিচিত ভাষা, ঠোঁটে সস্তা সিগারেট। সাধারণত ওদের পাবেন দুপুরে এবং যেসব হলে ইংরেজী ছবি দেখান হয়—তার কাউন্টারে! রকফেলার সেখানে থাকবেই থাকবে।

'—হপ্তায় আমি দু'দিন যাই!' একটি ছেলে সগর্বে স্বীকার করল।

'—দু'দিনই ইংরেজী ছবি দেখতে?'

'—হ্যাঁ!'

'—বুঝতে পার?'

'—না।—তবে বোঝবার যেটুকু সেটুকু ঠিকই বুঝি—বুঝতে পারলেন দাদু!' ছেলেটি মিটিমিটি চোখে আমার দিকে তাকাল। শোনা গেল, সে ক্লাস নাইনে পড়ে!

অন্য পরিচয়ও আছে

'রকফেলার' যদি শুধুমাত্র খেলাধুলো (হক না পাড়ার গলিতেই), সিনেমা বা সকাল সন্ধ্যায় শুধু শিটি বাজিয়ে দিন যাপন করত তবে তাদের নিয়ে আজ এভাবে লিখতে না বসলেও চলত। দুর্ভাগ্যবশত এগুলো তার প্রাথমিক পরিচয় মাত্র। আসল পরিচয় শুনতে হলে আমাদের কান পাততে হবে অন্যত্র।

পুলিসের খাতায় উঁকি দিন একবার। কে 'রকফেলার', কে তা নয়, সেখানে আজও তা সে ভাবে গুছিয়ে লেখার রেওয়াজ চালু হয়নি বটে কিন্তু সংক্ষেপে যা লেখা আছে তাও একেবারে ফেলনা কিছু নয়।

১৯৫৯ সনের হিসেব:

ভারতে সে-বছর নানা জায়গায় যেসব রকফেলার পুলিসের

হাতে ধরা পড়েছিল তাদের সংখ্যা ছিল—৪৭,৯২৫ ! তার আগের বছর (১৯৫৮) এই সংখ্যাটা ছিল—৩০,০০০ ! অর্থাৎ বৃদ্ধির গতি বছরে প্রায় শতকরা—৬০ !

এই তথাকথিত 'বালখিল্য ভারত-সন্তানদের অপরাধ কি ছিল জানেন ? পুলিসের বিবরণ-অনুযায়ী সেই কৃতকর্মের তালিকায় ছিল—হত্যা, নারীর সম্ভ্রমহানি, অপহরণ, ডাকাতি, মাতলামি, দাঙ্গা, চুরি, মারামারি, ভিক্ষা—ইত্যাদি।

সম্প্রতি আর একটি আধা-সরকারী সমীক্ষায় দেখা গেছে—প্রথম শ্রেণীর অপরাধগুলো পরিমাণে সমুদয় অপরাধের শতকরা প্রায় ৩৬ ভাগ দখল করে আছে। এবং পুলিস রিপোর্টে জানা গেছে '৫৯ সনে ধৃত ডাকাতদের মধ্যে এমন দুজনকে পাওয়া গেছে বয়স যাদের বারো বছরেরও কম।

প্রতি সপ্তাহে ৫০টি আর্তনাদ

গেল বছর আগ্রায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত যুব সম্মেলনে যে সব তথ্য শোনা গেছে সেগুলো আরও লোমহর্ষক।

কলেজের শিক্ষকেরা সখেদে জানিয়েছেন—ছেলে-মেয়েরা এখন নিজেদের পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়েই ব্যস্ত। তারা ক্লাসে বসে না, পড়া শুনতে চায় না।

উত্তরে ছেলেরা কি বলেছিল জানেন ? '—সত্যিই ক্লাসে বসে ওসব ননসেন্স শুনতে আমাদের ভাল লাগে না।'

তাদের কি ভাল লাগে, তাও আলোচিত হয়েছিল ঐ সম্মেলনে। ছেলেরা প্রকারান্তরে জানিয়েছিল—তাদের ভাল লাগে 'মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে আলোচনা করতে।'

উত্তর প্রদেশের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ সম্পূর্ণানন্দ আরও একটু বিশদ করেছিলেন তাদের বক্তব্যটা। তিনি বলেছিলেন :

'Individually as well as in groups they discuss

the proportions of maidens, their adipose tissues and their coy looks.'

'...এট টাইমস উই অলসো টিজ বয়েজ'—সাহসিকতার সঙ্গে এগিয়ে এসে সগর্বে দায়ভাগী সেজেছিলেন নাকি একটি তরুণীও। (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ভূপালে সম্প্রতি মেয়েদের জন্য একটি স্বতন্ত্র কলেজ খোলা খোলা হয়েছে। কিন্তু সেখানে কোন ছাত্রী নেই। অথচ ওদিকে সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা-সম্বলিত কলেজগুলোতে তিল ধারণের স্থান নেই।)

বিদ্যায়তনের আঙ্গিনায় অনুষ্ঠিত হয় বলেই ছেলে-মেয়েদের এইসব কর্মবিবরণীকে এড়িয়ে যাওয়ার একটা চেষ্টা অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়স্কদের মধ্যে দেখা যায় বটে, কিন্তু এই ছেলে-গুলোই যখন কলেজ থেকে দূরে, পথে এবং পার্কে নামে তখন ?

বোম্বাইয়ের পুলিস বলে—'আমরা প্রতি সপ্তাহে রাজপথে গড়ে পঞ্চাশটি আর্তনাদ শুনতে পাই। নারীকণ্ঠের আর্তনাদ। বক্তব্য : রাস্তা থেকে বেপরোয়া জোয়ানরা তাদের কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে। কে আছ রক্ষা কর!

কলকাতায় এমন চিৎকার হয়ত শোনা যায় কম। কিন্তু পুলিস বলে—হপ্তায় গড়ে পনেরটি মেয়ে কিংবা তাদের অভিভাবক এ শহরে তাদের সাহায্য চান।

ওরা কখনও মেয়েদের বাসের পেছনে রেসের সাইকেল নিয়ে ঘোরে, কখনও আসা-যাওয়ার পথে আড়ি দিয়ে এ কথাটি সে কথাটি ছুঁড়ে দিয়ে যায়, কখনও বা ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জানালা-সই করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলো বিখ্যাত সিনেমার নায়ক অথবা নায়িকাদের মুখ থেকে ধার-করা গানের কলি) কেউ কেউ আরও বেপরোয়া। তারা সোজাসুজি কলম ধরে, কিংবা টেলিফোনে আবেদন পেশ করে। পুলিসের মতে—

'আপাতত এ শহরে শেষোক্ত মাধ্যমটিই রোমিওদের সবচেয়ে মনের মতন।'

গোড়া থেকে গড়ে তোলা

ফ্লোরিডা কিংবা ইতালীর সমুদ্র-সৈকতে যা হয়েছিল, কিংবা অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজে বোট রেসের রাত্তিরে যা হয়—সে-তুলনায় হয়ত আমাদের দেশের এসব ঘটনা কিছুই নয়। বিশেষ করে, পুলিসের খাতাগুলো পাশাপাশি রাখলে যেন তাই মনে হয়।

কলকাতায় 'বালখিল্য' অপরাধী যারা পুলিসের হাতে ধরা পড়ে তাদের সংখ্যা বছরে গড়ে ৩,০০০। শহরের সমুদয় অপরাধীদের তারা শতকরা ৪ ভাগ মাত্র। কিন্তু লণ্ডনে গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রেও তারা শতকরা প্রায়—৩০·৭ ভাগ। চুরি-রাহাজানির ক্ষেত্রে আরও বেশী। সেখানে 'টেডিবয়'রা প্রায় শতকরা ৬৯ ভাগ। নিউইয়র্কে অবস্থা আরও শোচনীয়। সেখানে জঘন্য রকমের যে সব অপরাধ সংঘটিত হয় তার শতকরা প্রায় ৪৭ ভাগই কমবয়সী বীরবৃন্দের কীর্তি।

তাই বলে কলকাতা নিয়ে কি ভাববার কিছু নেই আমাদের? দায়িত্বশীল প্রতিটি শিক্ষাব্রতী প্রতিটি অভিভাবক বলবেন—'আছে'। তাঁদের মতে—পুলিসের খাতাটি যত পরিষ্কার আমাদের সমাজটা ঠিক ততখানি নয়। যদি তাঁদের চোখ (সেই সঙ্গে কর্তব্যবোধ) থাকত তবে আতঙ্কগ্রস্ত সৎ নাগরিকদের মত শিউরে উঠে তাঁরাও আবিষ্কার করতেন:

কলকাতার পথে পথে বালখিল্য অনাচার দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। (গুণ্ডা-দমন আইনটি আজ কোথায়?) শুধু গলিতে ক্রিকেট, ফুটবল, কুস্তি বা সাইকেল রেস নয়—অন্যবিধ খেলাও—বাড়তির দিকে।

ফলে—পাড়ার পানের দোকানগুলোতে সিগারেট (কমবয়সী বালকদের পক্ষে ধূমপান আইনত অপরাধ। কিন্তু সে-আইনে

এপর্যন্ত একটি ছেলেরও কি সাজা হয়েছে ?) এবং সোডার বোতলের বিক্রি বেড়ে গেছে।

দ্বিতীয়ত, কলকাতার পথে পথে মেয়েদের নিরাপত্তা কমতে কমতে আজ প্রায় শূন্যে এসে ঠেকেছে (যে কোন বছরের পুলিস রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)।

তৃতীয়ত, কলকাতার স্কুল-কলেজে, খেলার মাঠে ; ট্রামে, বাসে, হাটে—সর্বত্র উচ্ছৃঙ্খলতা বেড়ে চলেছে। কলেজে যখন ক্লাস চলে ছেলেরা তখন কাছাকাছি পানের দোকানে 'অনুরোধের' আসর শোনে, সরকারী বাস যখন রাস্তায় পোড়ে ছেলেরা তখন জলের বদলে পেট্রোল খোঁজ করে ('ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে !') এবং বাবা-মা যখন শেষ রক্তবিন্দুটুকু ধরে দিয়ে সংসার-টাকে গোড়া থেকে গড়ে তুলতে চান—কুড়ি বছরের ছেলে তখন গোড়া থেকে গড়ে তুলতে চায় নিজের মাথাটা।

একজন মধ্যবিত্ত পিতার কাছে শোনা। সেদিন হঠাৎ বাড়ি ফিরে তিনি দেখেন তাঁর বড় ছেলেটির (কুড়ি বছর) মাথা একদম ক্ষুর দিয়ে সমান করে কামান।

'—কি ব্যাপার রে ?'

ছেলে উত্তর না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অবসরে মা জানালেন—কোন এক কুমারের মত চুল ছাঁটতে চায়। কিন্তু কিছুতেই নাকি তা হচ্ছে না,—আজ তাই শেষে এই কাণ্ড করে এল। বলছে, 'গোড়া থেকে গড়ে তুলব।'

'কি করে জানলেন ?'

যাঁরা নজর রাখছেন তাঁরা বলেন,—এখানেই শেষ নয়, জল আরও বহু দূরে গড়িয়ে গেছে। বালকেরা তাদের পিতা পিতা-মহদের ছাড়িয়ে বহু দূর এগিয়ে গেছে।

পাঁচ দশক আগে এদেশের তরুণেরা যে বয়সে লুকিয়ে লুকিয়ে তিলকের 'গীতা', অশ্বিনী দত্তের 'ভক্তিযোগ' বা সখারামের 'দেশের

কথা' পড়ত, আজকে সে বয়সের কলেজ বয় প্রকাশ্যে 'বিবেকানন্দ গ্রন্থাবলী'র জন্যে টাকা পাঠাতে সাহস পায় না। কেননা প্রস্তাবটা শোনামাত্র গোটা হস্টেলের ছেলেরা তার পেছনে লেগেছে। "ইতিমধ্যেই আমার স্বামীজি নাম হয়ে গেছে।"

দ্বিতীয়ত, কুড়ি বছর আগেও যে ছেলেরা শরৎচন্দ্রের বই পড়ত পালিয়ে পালিয়ে, আজকে সন্ধ্যার চৌরঙ্গীতে তারা ফরেন বুক খুঁজে বেড়ায় প্রকাশ্যে। আর সিনেমা বা গ্লেমার পত্র? শুনলে অবাক হয়ে যাবেন—কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে প্রতিদিন গড়ে যে তিরিশজন ছাত্র পড়তে যান—তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যান শুধু ওসব সাময়িকপত্র বা উত্তেজক বই পড়তে।

তৃতীয় সংবাদটি আরও মারাত্মক। জনৈক বার-মালিক সখেদে বললেন,—'দশ বছর আগেও যে ছেলেরা চায়ের দোকানে ঢুকতে এদিক-ওদিক তাকাত এখন তারা কন্নুইসারের মত এখানে বসে কোন তরলের কি গুণ তাই নিয়ে আলোচনা করে।'

এমন কি সে বস্তু আজ স্কুলের ছেলেদের পর্যন্ত চেনা-জানা। একজন প্রবীণ গৃহশিক্ষকের কাছে শোনা:

সেদিন হঠাৎ তাঁর ছাত্র কানের কাছে মুখ এনে বলল—'মাস্টার-মশাই জানেন?—আমার মেসোমশাই না টানেন।'

মাস্টার চমকে উঠে বললেন—'কি, মদ?'

খিল খিল করে হেসে উঠল ছেলেটি,—'কি করে জানলেন?' উল্লেখযোগ্য শিশুটি ক্লাস সেভেন-এ পড়ে।

প্রশ্ন: কেন এমন হচ্ছে?—কার অপরাধে? এ দায়িত্ব কার? —মা বাবার?—দেশের?—পুলিসের?—যুগের?

উত্তরটা এক কথায় দেওয়ার মত নয়।

॥ দুই ॥

"—ব্রেস !—ব্রেস লিখেছেন দাদা !"

জনৈক রকফেলার
পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা

"...রচনাটির নামকরণ সম্পর্কে আমাদের একটু আপত্তি আছে। লেখক নিশ্চয় স্বীকার করিবেন, তিনি যাহা লিখেছেন নওজোয়ান মাত্রেই তাহা নহে।—

বিদ্যাধর নাগ
বেলেঘাটা, কলিকাতা

"...পাড়ার ছেলেরা আপনাদের কি অনিষ্ট করিয়াছে জানি না ; তবে অভিজ্ঞতা হইতে ইহাই বলিতে পারি যে তাহারা আছে বা থাকে বলিয়াই পাড়াগুলিতে আজও নিরাপদে বাস করা যায়।..."

—জনৈক পাড়া-প্রতিবেশী,
বাগবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা

"...'রকফেলার'দের প্রসঙ্গে সমাজের যে লজ্জাকর চিত্র আপনারা তুলিয়া ধরিয়াছেন, তজ্জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে চাহি—ইহার জন্যে কি সর্বতোভাবে তাহারাই দায়ী ?... মাঝে মাঝে চিত্রতারকাদের যে ফুটবল খেলার আয়োজন হয়, তাহার উদ্যোক্তা কাহারা ? বালকেরা নিশ্চয়ই নহে।..."

—জনৈক শিক্ষাব্রতী
হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

*　　*　　*

প্রশ্ন ছিল—কেন এমন হচ্ছে ? আজকালকার ছেলেরা কেন আর 'ছেলেদের মত' থাকছে না ?—রাতারাতি হঠাৎ এমন কি হল যে রেল এমনি পথ ছেড়ে বিপথ ধরে চলল ? দোষটা কি তার রথের ?—পথের ?—সারথির, না অন্তর্যামীর ?

উত্তরটা সহজ নয়। কারণ, লক্ষণের দিক থেকে রোগটি বাস্তবিকই জটিল। এক দেশের 'মেটেরিয়া মেডিকার' সঙ্গে অন্য-দেশের বড় একটা মিল হয় না। হতে চায় না।

জার্মানীতে ওঁরা বলেন—এ ছেলেরা যুদ্ধের ফসল। অধিকাংশই মা-বাপহারা। ফলে বেপরোয়া।

ইংলণ্ডেও অনেকটা তাই। ওরা প্রভূত যন্ত্রণার মধ্যে জন্মেছে। এবং জ্ঞান হওয়া মাত্র ওয়েলফেয়ার-স্টেটের আদরে পড়েছে। মাঝখানে যে ফাঁকটা সেটা বিনাশ্রমে অতিক্রান্ত বলেই এরা সমাজ-সম্পর্কে এমন বিরক্ত, ক্লান্ত।

আমেরিকার পটভূমি একটু অন্যরকম। দখল-করা জমিতে গড়ে-তোলা সভ্যতা বলেই ওরা একটু ডানপিটে প্রকৃতির। তদুপরি 'এফ্লুয়েন্ট সোসাইটি'র অঢেল ঐশ্বর্য এবং বিজ্ঞাপনের বাহার। সুতরাং—

কিন্তু সুইডেন? সভ্যতা-ভব্যতা, উচ্চমানের জীবনযাত্রা, নিরপেক্ষতা,—ইত্যাদি যাবতীয় করায়ত্ত থাকা সত্ত্বেও সুইডেনের ছেলেদের হাতে আজ কেন বাইসাইকেল-চেন এবং পাইপ-গান?

অস্ট্রেলিয়ার ওঁরা পরীক্ষা করেছিলেন এক দঙ্গল ছেলেকে। দেখা গেছে ওদের বুদ্ধি-বিদ্যা ('আই. কিউ') প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট। ফ্রান্সে এবং দক্ষিণ-ইতালীতে দেখা গেছে—শিক্ষাদীক্ষায় শিল্পে-সংস্কৃতিতে উৎসাহ ওদের বোমা, পিস্তল বা রাস্তাঘাটে দাঙ্গা করার মতই।

সুতরাং, যুদ্ধ নয়, খাদ্যাভাব নয়, শিক্ষার অভাব নয়, ঐতিহ্যবান সামাজিক পটভূমির অভাবও নয়; বিশ্বব্যাপী এ রোগের কারণ সম্ভবত অন্যত্র। রোগজীবাণু হয় এর বিশেষ কোন কোনটিতে, না হয় সব কটিতে, অথবা নিশ্চয়—অন্য কিছুতে। সে কারণেই বলছিলাম—'রকফেলার'দের রোগটা সহজ নয়।

পটভূমিটা একেবারে লাইজল-এ ধোয়া নয়

মন দিয়ে পাড়ায় পাড়ায় সেই ভিড়গুলোর দিকে তাকান একবার দেখবেন—আপনিও হাজির আছেন এই অভূতপূর্ব রঙ্গমঞ্চে। শুধু আপনি নন, হাজির আছেন সকলে,—বাবা, মামা ; সরকার, পুলিস; রাজনৈতিক দল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সবাই।

সত্য বটে, কলকাতার পথে পথে যে ছেলেরা আজ টেনিস বলে ফুটবল খেলে, কিংবা সোজা বোতল-যুদ্ধ করে তারা অধিকাংশই জীবনে আসল যুদ্ধ দেখেনি। কিন্তু যুদ্ধের ফলাফলটাও কি স্রেফ গড়ের মাঠে মারা গেছে ওদের অগোচরে ? নিশ্চয় নয়। 'ব্ল্যাক আউট'—অন্ধকার পথ, কালোবাজার, রেশন কার্ডের লাইন ; দুর্ভিক্ষ, বিপর্যস্ত মধ্যবিত্ত,—এত সব ক্রিয়া যেখানে প্রতিক্রিয়া সেখানে কিছু হবে বৈকি।

তারপর আছে—স্বাধীনতা, দেশবিভাগ, দাঙ্গা। পাড়ায় পাড়ায় চাঁদা আদায়, শান্তি (!) কমিটি, বোমা তৈরী ; ওদিকে সব ফেলে সহসা একদিন নিরুদ্দেশ যাত্রা, বাচ্চা ছেলের কোমরে গুঁজে দশ টাকার নোট দু'খানা···ক্যাম্প, ভলানটিয়ার, দরখাস্ত,··· জবর দখল, বিনেটিকিটে ভ্রমণ, জরিমানা···জেলখানা—আজকের তরুণদের মনে নিশ্চয়—'এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন···'। এসব তাদের চোখে-দেখা ঘটনা। সুতরাং, যুদ্ধের পরে ক্ষুধার্ত ইতালীয়ান যুবক যখন নিজের বোনের বদলে সৈন্যদের কাছে রুটি ভিক্ষে করতে পারে, তখন এত ক্লান্তির পর রিফিউজি বালক কি বাবার পকেট মেরে একশো সিনেমা দেখতে পারে না ?

বাবাকে পুজোয় কাপড় দেওয়া যায় না

মানসিক এই পটভূমির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শহুরে ক্ষুধা। শহরে সব আছে। ভাল বাড়ি, ভাল গাড়ি, ভাল ক্লাব, ভাল হোটেল, ভাল দরজি, ভাল সেলুন—সব। অথচ এগুলোতে কোন অধিকার নেই তার! (পশ্চিম ব্যাধি : হায়, কেন এগুলো চাওয়ামাত্র

পাওয়া যায় ? অথবা—হায়, জোন্সদের গাড়িটা কেন আমাদেরটার চেয়ে ভাল দেখায় ?) বিদ্রোহ তরুণের রক্তের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। চিরকাল তার লড়াই প্রথমত তার নিজের সঙ্গেই। কিন্তু এবার অন্যদের বিরুদ্ধেও নামতে আপত্তি নেই। কেননা,—(মনে মনে) —'কেন থাকবে এই বৈষম্য ?'

কলকাতার রোয়াকে রোয়াকে যে যুথবদ্ধ অসামাজিক তারুণ্য, তার অনেকখানিই কারণ এই আর্থিক বৈষম্য। বিশেষত, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তের ঘরে উঁকি দিলে জানা যাবে আর্থিক বিপর্যয় আজ সেখানে কোন পর্যায়ে এসে ঠেকেছে।

একদিকে গ্রাম শুধু ভাঙছেই, ভাঙছে, অন্যদিকে শহরের লোকারণ্য ক্রমেই গভীর, আরও অন্ধকার হয়ে আসছে। পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন এখানে চেনাই যায় না। 'ফ্ল্যাট'-বাড়িতে ভাড়াটে থাকেন, প্রতিবেশী থাকে না। বাবা থাকেন এ পাড়ায়, ছেলে অন্য পাড়ায়। প্রথমে কৈফিয়ত ছিল স্থানাভাব, এখন স্পষ্টতই নৈতিক দায়িত্ববোধের অভাব। ছেলের নিজস্ব পরিবার আছে। সেটি বাঁচাতে হলে বাবাকেও পুজোয় কাপড় দেওয়া চলে না। বলা বাহুল্য, এমতাবস্থায় ছোট ভাই সম্পর্কে কথাই বলা চলে না।

তাছাড়া, ক'টি ছেলেরই বা চাকরি আছে আজ ? এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের খাতায় লেখা হিসেবটি শুনিয়ে লাভ নেই। আসল সংখ্যা তার চেয়ে অনেক বেশী,—অযুত পরিমাণ। তারা অনেকেই জানে না কবে কাজ পাবে, কিংবা আদৌ কোনদিন পাবে কিনা! ফলে, সেই সব হাজার হাজার আস্থাহীন তরুণ আজ কর্মকারণেই বেপরোয়া, তাদের অলস মস্তিষ্কগুলো যেন ডবল সীফটে চালু শয়তানের কারখানা! কাজ না দিয়ে এদের জব্দ করার আর কি উপায় আছে আমরা জানি না।

যারা আজ স্কুলে-কলেজে পড়ছে এই অনিশ্চিত জগতের

সমাচার তাদের কানেও পৌঁছে গেছে। সুতরাং,—'ছুত্তোর, কি হবে আর পড়ে? তার চেয়ে সেই ভাল, একটু কালের হাওয়া গায়ে লাগাই।'

নকল পড়ুয়া

তাড়ি বগলে যারা স্কুলে এবং কলেজে যায় তারাও সকলে পড়ে না। পড়তে চায় না, পড়তে পারে না।

প্রথমত এত এত ছেলের মধ্যে বসে পড়া যায় না। '—স্যার যে মাথামুণ্ডু কি বলেন কিছুই কানে আসে না।'

দ্বিতীয়ত,—যেহেতু কোন মরমানবের পক্ষেই সম্ভবপর নয়, সুতরাং 'কেটে পড়লেই' বা ধরে কে?

তৃতীয়ত,...ছ' হাজার ছেলের কলেজের কমনরুমে দুটো মাত্র ক্যারামবোর্ড, টেনিসের একটি টেবিল। সুতরাং, পান অথবা চায়ের দোকান ছাড়া আর কোথায় যাবে ছেলেরা?—কলকাতায় পার্ক নেই। যা আছে যেখানে নিঃশ্বাস টানবার মত জায়গা নেই। সুতরাং, রিলে-রেস থেকে লীগ খেলা সব গলিতেই। এবং যেহেতু আকাশ এখনও মনে হয় কিঞ্চিৎ ফাঁকা ফাঁকা সুতরাং ঘুড়ি ওড়ানো বাড়বেই, 'বাড়ন্ত শহরের ঘরবাড়ীর মত খেলাও 'হরাইজেণ্টাল'!

চতুর্থত—আমাদের বহু আলোচিত শিক্ষাপদ্ধতি। এখানে তার বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ নেই। শুধু একটি উদাহরণ দিচ্ছি। সম্প্রতি মাদ্রাজের একজন ছাত্রীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল—'বলুন ত মাদ্রাজের প্রধানমন্ত্রী কে?'

'—আমাকে পরীক্ষা করছেন বুঝি?' মেয়েটি হেসে জবাব দিয়েছিল—'মনে রাখবেন, আমি পড়াশুনা করি!'

'—আচ্ছা, তাহলে বলুন না!'

'—বলব?—চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী।—কি হল ত?'

প্রশ্নকর্তা গম্ভীর ভাবে জবাব দিলেন—'না।'

'—না মানে ? মেয়েটি তক্ষুনি তার সিভিক্স বইখানা নিয়ে এল এবং পাতা খুলে দেখিয়ে দিল যে সত্যিই সেখানে লেখা আছে রাজাজীর নাম। বলা বাহুল্য, বইটি '৬১ সনে ছাপা হলেও সম্ভবত লেখা হয়েছিল '৫২ সনে !

অপাঠ্য পাঠ্য বই, অগণিত 'সিওর সাকসেস' তথা বটিকা এবং মুষ্টিযোগ, তদুপরি—গৃহশিক্ষক, লাল কলমে দাগানো ইমপরটেণ্ট ;—সুতরাং বর্ধমানের কলেজ-বয় সগর্বে বলে—"কমিউনিটি ডেভলাপমেণ্ট প্রজেক্ট' কি তাও জানি না ?—হুঁ, বাচ্চা ছেলেকে জিজ্ঞেস করুন সেও জানে—এ এক ধরনের নতুন জীপগাড়ির নাম।"

—আর স্ট্রাইক ?

শোনামাত্র যে কোন ছেলে বই নিয়ে লাফিয়ে উঠবে বেঞ্চির উপর, চিৎকার করে বলবে 'জিন্দাবাদ।'

জিন্দাবাদে কারা বাঁচে ?

'জিন্দাবাদ' মানে কি অনেকেই তা জানে না। খবর নিয়ে দেখা গেছে এদেশের শতকরা ৮৫ থেকে ৯৫ জন ছেলে রাজনীতি বিষয়ে কিছু ভাবে না। তা চীনাদের ভারতীয় জমি দখলই হোক আর বাংলাদেশের খবরের কাগজ সম্পর্কে নেহরুজীর মন্তব্যই হোক।

তবুও যাবতীয় রাজনৈতিক মিছিলের অগ্রভাগে যে দেখতে পান ওদের তার কারণ তরুণের স্বভাব চিরকাল ওরা উল্টোদিকে সাঁতার কাটার মত একটু স্রোতের জল চায়। তা যদি খেলার মাঠে পাওয়া যায়, তাহলেও যেমন কাজ চলে তেমনি মিছিলেও। বাস পুড়িয়ে রঙ্গ দেখাটা, পুলিসের গাড়িতে প্রকৃত দেশপ্রেমিকের মত পটকা মারাটা আসলে সে ধরনেরই একটু হাত পা ছুড়ে সাঁতার কাটা।

কলকাতার তরুণেরা গেল পনেরো বছর ধরে সানন্দে এই খালের জলে ভাসছে কারণ পেছনে প্রেরণাস্বরূপ আমাদের রাজনৈতিক

দলগুলো রয়েছে। লজ্জার কথা হলেও অনস্বীকার্য দলগত স্বার্থে আজ পেশায় তারা প্রকৃতই 'ছেলেধরা'।

'ছেলেধরা' বহুবিধ

'ছেলেধরা' আরও অনেক রকমের আছে। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সস্তা গান (জাজ-এর বিকল্প), সস্তা চটুল সাময়িকপত্র সাহিত্য এবং তীব্র সিনেমা ও রকমারি লাল নীল বিজ্ঞাপন। দেওয়ালে যে রূপবতী আঁঠা দিয়ে সাঁটা পর্দায় সে নিশ্চয় আরও জীবিত। সুতরাং 'চল—লা লাইন লাগাই।'

উল্লেখযোগ্য শিটি-মুখরিত নানা বাসনার রঙে রঞ্জিত এই লাইনগুলোরই অফিসিয়াল নাম 'বক্স-অফিস'। এবং আরও উল্লেখযোগ্য পত্রলেখকের উল্লেখিত ক্রীড়াযোজনটির মত এই নামটিও সত্যিই বড়দের দেওয়া।

আমরা বড়রা আমাদের তরুণদের অনেক দিয়েছি। ভাঙ্গা ঘর, মনে রাখবেন কলকাতার হাজারকরা ৮৪টি ছেলের বাড়িতে পড়বার একদম জায়গা নেই। প্রভূত বেকার, আদর্শহীন এলোপাথারি জীবন, দায়িত্বহীন অভিভাবকত্ব এবং কি নয়?

পরিবর্তে আজ মাঠে-ময়দানে স্কুলে-কলেজে, গলিতে ছাদে যা দেখে থাকি সে কি সত্যিই বিস্ময়কর?

নাটক ও দর্শক

বিস্ময়কর দৃশ্যটা নয়, আসল বিস্ময় দর্শক হিসেবে আমাদের চেতনহীন ভূমিকাটা। কেউ কেউ রোয়াকে লোহার কাঁটা বসিয়েছেন বটে কিন্তু হায় এদেশ জানে না—যে ব্যাধির কবলে আজ আমরা পড়েছি এ কণ্টকাসন সেখানে কিছুই না। অন্য দেশের দিকে তাকিয়ে দেখুন, সেখানে চিন্তাশীলেরা আজ নির্ঘুম। দেশের তরুণদের চিন্তায় তাঁরা নিজেরাই আত্মশয্যা কণ্টকীর করলে।

মনে পড়ছে নিউ ইয়র্কের পুলিস কমিশনারের কথা। তিনি বলেছিলেন—'দে সে সাম ইয়ং পাঙ্ক ইজ দি প্রডাক্ট অব হিজ

এনভাইরনমেন্ট।—ওয়েল হু ইজ নট?' সুতরাং আদেশ হয়েছিল —"কেন এমন হচ্ছে অন্যরা তা ভাবুন, তুমি পুঁলিস তোমার কাজ তুমি করে যাও।"

কলকাতার পুলিসও একদিন এই প্রতিজ্ঞা মুখে নিয়ে পথে নেমেছিল বটে কিন্তু যে কোন পাড়ার ছেলে জানে—'সেদিন এখন আর নেই।'

পুলিসের রিপোর্ট দেখেও তাই মনে হয়। দুজনকে ধরে এনে তারা দাড়ি কামিয়ে দিলেন, দশজনকে এখানে-ওখানে সংশোধনার্থে পাঠালেন, জনাকয়েককে ধমক দিলেন, কিছু কোর্টে পাঠালেন—এমনি ছোটদের যোগঅঙ্কের মত সহজ হিসেব। অথচ কর্তব্যপালন করলে নিশ্চয় দেখা যেত—যোগফলটি অন্যরকম।

কেন এমন হল? পাড়ার-ছেলের কাছে কেন হেরে গেল কলকাতার পুলিস? দিল্লিতে আঠার বছরের চেয়ে কমবয়েসী ছেলেদের সামনে বন্ধ হয়ে গেছে ম্যাটিনি শোর দরজা, কেন কলকাতায় তা হচ্ছে না?—বোম্বাইতে এসব ছেলেদের জন্যে রকমারি কমিটি বসেছে—কেন কলকাতায় তা শোনা যায় না?

কারণ সম্ভবত কলকাতা আজ সত্যিই পাড়ার-ছেলের করতলগত। আমরা যে শুধু ওদের তৈরী করেছি তাই না, ওদের বাদ দিয়ে আমাদের আজ কিছুই চলে না।—না দুর্গোৎসব, না স্ট্রাইক, ইলেকশান ইত্যাদি মহোৎসব!

রুটি আউর বেটি

"উত্তমর্ণ ব্রাহ্মণ অধমর্ণের নিকট শতকরা দুই পণ, ক্ষত্রিয়ের নিকট তিন পণ, বৈশ্যের নিকট চারি পণ এবং শূদ্রের নিকট পাঁচ পণ হিসাবে প্রতিমাসে সুদ লইতে পারিবে।"

(মনু—৮ : ৪২)

"জাত-ব্যবসা নরের ভূষা, আর সব ফাসাফুসা।"

(প্রাচীন বাংলা প্রবাদ)

"...বিহারের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণান্তে মনে হয়—শ্রী সহায়ের ভবিষ্যৎ এখন অন্যদের অপেক্ষা উজ্জ্বল। কারণ, তিনি কায়স্থ।

(—একটি সাম্প্রতিক সংবাদ।)

"Untouchability" is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of 'untouchability' shall be an offence punishable in accordance with law........."

[—Constitution of India,
Part-II, Article-17]

"—আসুন, পেশাগত বিভেদ ভুলিয়া অপরিচিত সকলকে আমরা সম্বোধন করি 'আপনি' বলে।"

(কলকাতার ট্রামে একটি বিজ্ঞাপন)

"...দেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। উহাতে অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ এবং সম্প্রদায়িকতা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। জাতিভেদ আজ আর সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে না। উহা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে

দেশের জীবনকে প্রভাবিত করিতেছে।…নির্বাচনে জয়লাভের জন্য আমরা জাতিভেদ প্রথাকে কাজে লাগাইতেছি।…”

(—জাতীয় সংহতি সম্মেলনে ডঃ রাধাকৃষ্ণণ)

অবশেষে জাতীয় সংহতি সম্মেলন। ইতিমধ্যে দেশে ‘অস্পৃশ্যতা’ নিষিদ্ধ করে আইন জারী হয়েছে, বিশেষ বিবাহ আইন পাশ হয়েছে, সম্পত্তি ও চাকুরির ক্ষেত্রে সকলের সমানাধিকার স্বীকৃত হয়েছে এবং নানা দলের নানা নায়কের মুখে নানা ভাষায় ঘোষিত হয়েছে জাতি ও বর্ণ-নিরপেক্ষ পরিচ্ছন্ন প্রগতিশীল সমাজাদর্শ।—কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কি সত্যিই আমরা মেনে চলেছি তা? রেভাঃ বাঁড়ুয্যে কি সত্যিই পরিচ্ছন্ন মনে মেয়ে দিতে পারেন রেভাঃ চক্রবর্তীর ঘরে? বিহারের কায়স্থ কি ‘গোঁফ জোড়াটা দেখবার পরও’ স্বচ্ছন্দে ভোট দিয়ে আসতে পারেন—রাজপুতের বাক্সে? কিংবা আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন সাম্যবাদী কি পারেন এখনও অনায়াসে এড়িয়ে যেতে তাঁদের হাততালি প্রকাশ্যেই যাঁরা সাম্প্রদায়িকতাবাদী?

সম্ভবত, অনেক ক্ষেত্রেই—না।

মার্ক্সবাদী ও মনুপন্থী দু’জনের ব্যবধান সত্যিই আজও এদেশে খুব বেশী নয়।

পিতৃতান্ত্রিক আর্যসমাজে কি করে একদিন উদ্ভূত হয়েছিল বর্ণাশ্রম, তার বিস্তারিত আলোচনা এখানে অবান্তর। শুধু এটুকু সংবাদই এখানে যথেষ্ট যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র নামে যে চারিটি বর্ণ আমাদের মুখস্থ তার বাইরেও সেদিনকার ভারতে ছিল—অসংখ্য বর্ণ, জন ও কোম। মনু-যাজ্ঞবল্ক্য থেকে শুরু করে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে রঘুনন্দন পর্যন্ত নানা সমাজশাস্ত্রী নানা যুক্তির ফাঁদে তাদের এই চার কোঠার কোন একটিতে বন্দী করে সমাজকে সুবিন্যস্ত (!) এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন মাত্র। দ্বিতীয়ত আদিতে একদিন যা ছিল সত্যিই গুণ এবং কর্ম-ভিত্তিক বিভাজন,

ক্রমে বিস্তৃততর এবং জটিলতর সামাজিক এবং আর্থিক কাঠামোতে তা-ই পরিণত হল কতকগুলো সামাজিক জারি-জুরিমূলক বিধি-নিষেধে। যথা: 'মস্তকের কেশ পিঙ্গল বা রক্তবর্ণ…চক্ষু পিঙ্গল এমন কন্যাকে বিবাহ করিতে নাই' (—মনু) বা 'হরিদ্রা রঙের কাপড়-পরিধানকারী ব্যক্তিগণ অশুভদর্শন (—যাজ্ঞবল্ক্য) কিংবা 'ব্রাহ্মণ চারিবর্ণের কন্যাকেই বিবাহ করিতে পারিবে, কিন্তু স্ববর্ণের স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র সম্পত্তির অধিকাংশ পাইবে' (—কৌটিল্য)।

এগুলো নমুনা মাত্র। 'স্মৃতি'র জালে আবদ্ধ হয়ে আর্যসমাজ ক্রমে তার পূর্বেকার উদারতা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হল। নিজেদের আর্থিক এবং সামাজিক প্রভুত্ব বজায় রাখতে সমাজের একাংশ শুধু যে তাঁদের তথাকথিত রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষার্থেই মনোযোগী হলেন তাই নয়, দৈনন্দিন জীবনকেও তাঁরা শাস্ত্রীয় আচার-বিচারে নিয়ন্ত্রিত করতে মনস্থ করলেন। ফলে কার সামনে কে কোন্ আসনে বসবে তা যেমন নির্দ্দিষ্ট হল তেমনি কার ঘরে কে জল গ্রহণ করলে পতিত হবে তাও স্থিরীকৃত হল। এক কথায় বর্ণ তখন স্বামিজী যাকে বলেছেন—ভাতের হাড়ি সেই রান্নাঘর এবং বিবাহ-বাসরকে আশ্রয় করে বাঁচবার হাস্যকর চেষ্টায় মত্ত হল। ফলে পশ্চিমীরা চলতি ভাষায় তার নাম দিল—রোটি আউর বেটি! আশ্চর্য এই, হাজার হাজার বছর পরে আমাদের জাতিত্ব প্রধানত আজও সেই ভাতের হাঁড়ি আর কনের পিঁড়ি ধরেই ঘুরছে।

প্রথমে ভাতের হাঁড়ি তথ্য খাওয়া-দাওয়ার কথাটাই বলি। সত্য বটে আমরা যাঁরা শহরে বাস করি, আজ আর তাঁরা 'মুসলমানের দোকানের বিস্কুট' খেতে দেহে বা মনে 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের মত কোন রোমাঞ্চ অনুভব করি না, বা 'কালাপানি' ডিঙ্গিয়ে বিলেত যাওয়ার সময় সঙ্গে শিশি করে গঙ্গাজল নেওয়ার জন্যেও বায়না ধরি না। এমনকি আজন্ম ব্রাহ্মণোচিত অভ্যাসে লালিত গর্বিত ব্রাহ্মণতনয়ও আজ চাল এবং চিড়ের পার্থক্য নিয়ে চুলচেরা বিচারে

বসেন না। কেননা, 'সেনেরা' সেই পথ ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছে !

বেশী দিন আগের কথা নয় উনবিংশ শতকের শেষদিকে কলকাতায় একটি ছড়া প্রচলিত ছিল। তার মর্ম ঃ

"জাত মারল তিন সেনে
কেশব সেনে
ইস্টিশনে
উইলসনে !"

কেশব সেন মানে ব্রাহ্মধর্ম, ইস্টিশন—রেলপথ ! আর উইলসন ?—উইলসন ছিলেন অ্যাকল্যাণ্ড তথা আজকের গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলের মালিক। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য রামমোহন তথা ইংরেজী শিক্ষার সূচনায় মুখে মুখে উক্ত আর একটি ছড়া। তার বক্তব্য ঃ

"খানাকুলের বামুন করেছে একটা স্কুল
জাতের দফা রাখবে নাকো,
থাকবে নাকো কুল !"

একদিকে ইংরেজী শিক্ষা এবং অন্যদিকে রেল, জাহাজ ইত্যাদি বেগযানসম্বলিত আধুনিক নগর-সভ্যতার পত্তন, ফলে কলকাতা বা দিল্লির মত শহরে মনু বা কৌটিল্যের পথে হাঁড়ি বাঁচিয়ে জাতি রক্ষা প্রায় অসম্ভব বিবেচিত হতে বাধ্য। ফলে, অস্বীকার করে লাভ নেই হাঁড়ির ক্ষেত্রে শহরে আজ আমরা সম্পূর্ণ পরাজিত। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে ?—বলা নিষ্প্রয়োজন, সেখানে আজও বেঁচে আছেন নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ (এঁদের একটি শাখা অব্রাহ্মণকে পত্নী হিসেবে গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁর হাতে খান না। এমনকি দিনে তাঁর ছায়া স্পর্শও নাকি তাঁদের বারণ !) তদুপরি মনে রাখতে হবে—চৈতন্য থেকে শুরু করে গান্ধীজী পর্যন্ত স্মরণকালের বহুজনের সাধনা অন্তেও গ্রামে গ্রামে আজও কুয়ো নিয়ে দাঙ্গা হয়, বে-পঙতিতে ভোজন সংবাদ যথাস্থানে কর্ণগোচর হলে হুঁকো বন্ধ হয় এবং 'ক্ষৌর কার্য নেহি

করে গা' জবাবের প্রতিকার করতে হলে দুঃসাহসীর মত পুলিশের দ্বারস্থ হতে হয়। তাছাড়া এটাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কয়েক হাজার অনুচরসহ ডক্টর আম্বেদকরের বৌদ্ধ-ধর্ম গ্রহণ স্বাধীনতার পরের ঘটনা। এবং এখনও বছর বছর মিশনারীরা যে প্রোগ্রেস রিপোর্টগুলো ছেপে প্রচার করেন, তার পেছনেও অনেক ক্ষেত্রেই রয়েছে এই একই কারণ। '—হুঁসিয়ার! হুঁসিয়ার! পিছু মে বামুন আতা হ্যায়!' অর্থাৎ রাস্তা থেকে সরে যাও, পেছনে যিনি আসছেন তিনি ব্রাহ্মণ!

এই ছোঁয়াছুঁয়ি ব্যাপারটা যে শুধু ব্রাহ্মণ আর অন্ত্যজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তা নয়। বর্ণে বর্ণে শ্রেণীতে শ্রেণীতে—তা আজও এমন জটিল যে লিখে বোঝাতে গেলে মনে হবে যেন সর্ববুদ্ধি দিয়ে এক গোলকধাঁধা ফেঁদেছি!

ব্যাপারটা যে সত্যিই ধাঁধার মত তা বুঝতে আচার-পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করার দরকার নেই। গ্রামে গ্রামে ঘুরে তথ্য-সংগ্রহও অনাবশ্যক। শহরের হোটেলখানায় বসে আছেন, সেখানেই থাকুন। শুধু দয়া করে একটিবার সামনের কাগজটা খুলুন। দেখবেন—চোখের সামনে আমাদের শাসনতন্ত্র, আমাদের যুগানুক্রমিক প্রাগ্রসর ভাবনাকে ব্যঙ্গ করে আট দ্বিগুণে—ষোলটা কলাম জুড়ে উচ্চৈস্বরে চিৎকার করছে এই ছোট ছোট বাক্যগুলো:

'বৈদ্য পাত্র চাই। পাত্রী ধন্বন্তরি, বি-এ ধনাঢ্য ইত্যাদি'

'বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, ভরদ্বাজ গোত্র, ক্লাসওয়ান অফিসার।

'স্ব-মেলে উপযুক্ত পাত্রী চাই। পাত্র বিলাতযাত্রী।'

কিংবা

'ল ফাইন্যাল পরীক্ষার্থিনী···দক্ষিণরাঢ়ী, মৌলিক কায়স্থ পাত্রীর জন্য···।'

অথবা,

'বৈশ্য সাহা অপূর্ব সুন্দরী পাত্রী···।'

বা,

'রাঢ়ী ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ গোত্র বিশিষ্ট পাত্রের জন্যে··· !—পাত্র রেলে সুপ্রতিষ্ঠিত চাকুরে··· ।'

পাতাটা পড়তে পড়তে মনে হয় ১৯৬২ সনে ছাপা কোন রোববারের কাগজ নয়, যেন বহু শতক আগেকার কোন তাম্রশাসন পড়ছি, কিংবা বল্লালী যুগের কোন ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা। ভাবতেও অবাক লাগে বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী তরুণ আরও উচ্চ শিক্ষার্থে বিলাত যাত্রার আগে কুলপঞ্জী ঘাঁটছেন কিংবা প্রতিষ্ঠিত রেল-কর্মচারী ট্রেন বন্ধ করে সম্বন্ধ-নির্ণয় বা 'ঘটককারিকা' কোথায় পাওয়া যাবে তারই খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ! অথচ হায়, স্বীকার না করে উপায় নেই এদেশে আজও প্রকারান্তরে এটাই ঘটনা।

সত্য বটে ক'বছর হল 'সিবিল ম্যারেজ আইন' অনুযায়ী এদেশে আধুনিক ধরনের বিবাহাচার চালু হয়েছে। কিন্তু সেই মন্ত্র যে এখনও আমাদের মুখে রপ্ত হয়নি, তার প্রমাণও আছে। ১৯৫৮ সনে এই নতুন প্রথায় পশ্চিমবঙ্গে বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৩০১২টি। ১৯৫৯ সনে—৩৬৭৬টি এবং ১৯৬০ সনে তার চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশী। অথচ রোববারের 'পাত্র-পাত্রী সংবাদের' সঙ্গে যাঁদের বিন্দুমাত্র পরিচয় আছে কিংবা যাঁরা যে-কোন বৌভাতের তারিখে সাংসারিক কারণে একবার থলি হাতে বাজারে পা দিয়েছেন তাঁরাই জানেন—এই সংখ্যাগুলো বৈশাখের বা মাঘ মাসের কোন দিনে শুধুমাত্র কলকাতায় যত মালা আদান-প্রদান হয় তার কাছাকাছিও নয়।

অথচ, বলতে গেলে বল্লালের জীবৎকালেই প্রমাণিত হয়ে গেছে কৌলীন্য প্রথা যতখানি কুলীন বলে দাবি করে ঠিক ততখানি কুলীন সে নয় (যথা : 'কাশীসূত হরিহর ফুলিয়ার মুখটি। ভাল বিভা হৈল তোমার জুনিখানের বেটী 'কিংবা'···কের আরার পৈতা ছিল

কোনকালে, তাতে ত পৈতা দিল কৃষ্ণচন্দ্র দালালে' ইত্যাদি।…) তদুপরি দেবীবর থেকে শুরু করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পর্যন্ত লেখায়, গানে, প্রবাদে এবং আন্দোলনে এই কুলীনকুলসর্বস্বতার বিরুদ্ধে আন্দোলনও হয়েছে কম নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় 'রোটি' তথা হাঁড়ি শহরাঞ্চলে নড়বড় হলেও কি শহর, কি গ্রাম—'বেটি' বিষয়ে আমাদের প্রাগৈতিহাসিক চিন্তা-ভাবনা আজও যথা পূর্বাং! আজও ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের ঘরে পাত্রী খোঁজেন, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের ঘরে, বৈশ্য বৈশ্যের ঘরে। এমনকি শোনা যায়, এমন যে হিঁদুয়ানীর কলুষমুক্ত রেভাঃ মুখোটি তিনিও রেভাঃ চত্তোরির ঘরে কন্যা দানে রাজী নন! মেয়ে নিজে রাজী কিনা সে-কথা স্বতন্ত্র। মায়ে চান—ঘর! ফলে, খবর নিলে দেখা যাবে—সমান ঘর না পেয়ে আজও কুলপঞ্জী বুকে চাপা দিয়ে বহু 'জাতের মেয়ে গাঁতে মরছে'!—অর্থাৎ অন্ধকার গহ্বরে বা পর্দার আড়ালে, অন্দরে। অথচ প্রতিজ্ঞা আমাদের অন্যবিধ।—জাতি, বর্ণ এবং ধর্ম-নিরপেক্ষ মানুষের প্রতিজ্ঞা!

শুধু কি বিবাহ-বাসরে আর পঙক্তি ভোজনে? নজর করুন, দেখতে পাবেন কুলজী-শাস্ত্রের প্রভাব আরও বহু বহু দূর বিস্তৃত। এমনকি রাজধানী পর্যন্ত!

প্রশ্ন উঠতে পারে, এককালের সমাদৃত সমাজাদর্শ বর্ণাশ্রম যদি আজ শেষ পর্যন্ত রান্নাঘর আর অন্দরেরই ঘটনা হয়, তবে তাকে নিয়ে পার্লামেন্ট বা ময়দানে তর্ক তোলার সত্যিই কি কোন অর্থ হয়? অন্তত এখনও এমন অনেক উদার এবং প্রগতিশীল মানুষ আছেন যাঁরা মনে করেন 'রোটি' বা 'বেটি' এই বিরাট দেশের বিপুল কর্মধারায় ঘটনা হিসেবে—একান্তই ব্যক্তিগত।—তুচ্ছাদপি তুচ্ছ।—কিন্তু তাই কি?

ডঃ আম্বেদকর বা জগজীবন রামের অভ্যুত্থানের কাহিনী কিংবা যারবেদা জেলে গান্ধীজীর ঐতিহাসিক অনশন ও ভারত-ব্যাপী হরিজন আন্দোলনের ইতিবৃত্ত এখানে অনাবশ্যক। শুধু মাত্র একটা

পুরানো হিসেব শোনাচ্ছি। ১৯৩৬ সনে মাদ্রাজের বিচার বিভাগ জানাচ্ছেন, ঐ দপ্তরে যে-সব গেজেটেড অফিসার আছেন, তাঁদের বর্ণ-বিন্যাস করলে অবস্থাটা দাঁড়ায় নিম্নরূপ ঃ

ব্রাহ্মণ—	৬১৪ জন
অব্রাহ্মণ হিন্দু—	৩৭১ ,,
তপশীলভুক্ত হিন্দু—	৪ ,,
মুসলমান—	৯৮ ,,
অ্যাঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান—	৩৭৫ ,,
অন্যান্য—	১১ ,,

বলা যেতে পারে, যেহেতু ব্রাহ্মণেরা ; অন্যান্য শ্রেণী অপেক্ষা শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রসর সরকারী দপ্তরে তাই তাদের সংখ্যাধিক্য স্বাভাবিক। ১৯৩৬ সনে হয়ত কথাটার মধ্যে কিছু যুক্তি ছিল। কিন্তু অ্যাঙ্গলোইণ্ডিয়ান ? ব্রাহ্মণেরা অভিযোগ তুলেছিলেন তাঁদের এই প্রাধান্যের কারণ,—দেশের হর্তাকর্তা বিধাতা যাঁরা, তাঁরাও জাতিতে খৃষ্টান।

ঠিক তেমনি পরবর্তী স্তরের (যেখানে মামুলী শিক্ষাই ছিল মানদণ্ড) কর্মীদের, তালিকাটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে অব্রাহ্মণেরা এবং তপশীলভুক্ত জাতির নায়কেরা জানিয়েছিলেন—এই বৈষম্যের হেতু, দেশে ব্রাহ্মণ্য-প্রাধান্য। কেননা, যে চাকরীতে মাইনে মোটে একশ' টাকা সেখানেও— ব্রাহ্মণ যখন ৩৭৫৭ জন, তপশীল-ভুক্ত শ্রেণীর কর্মীর সংখ্যা তখন মাত্র ২০ জন।

উল্লেখযোগ্য, এ ধরনের স্ব-বর্ণ প্রীতির অভিযোগ বাংলা দেশেও এককালে শোনা গেছে। কখনও ব্রাহ্মণের সম্পর্কে, কখনও বৈদ্য বা অন্য কোন কুল সম্পর্কে। এমনকি শোনা যায়, কেরানীরা মুখে মুখে কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংসের নাম দিয়েছিল একবার—'বৈদ্যবাটী'। কেউ কেউ বলতেন—'গুপ্তিপাড়া'। এখনও নাকি ওপরের মহলে কোন বড় রকমের নাড়াচাড়া হলে তাঁরা বলেন—

"আমাদের সেন ডাইনেস্টি গেল, এবার শুরু হল 'গুপ্ত পিরিয়ড"! প্রকৃত আনুপাতিক হিসেবটা কি জানি না। শুধু এটুকুই বলতে পারি,—বর্ণভেদ যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ স্ব-বর্ণে আকর্ষণ স্বাভাবিক ঘটনা। এমনকি সেজন্য আইনলঙ্ঘনও বোধ হয় বিচিত্র না!

যেমন সেক্রেটারিয়েট, চাকুরি বা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, তেমনি রাজনীতিক্ষেত্রে। সত্য বটে, বর্ণচেতনা ভাষা বা ধর্মীয়-গোষ্ঠীর মত রাজনীতিক্ষেত্রে তত উচ্চাকাঙ্ক্ষী নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও যে রাজনীতিতে তার প্রভাব অবহেলা করার মত নয় তার প্রমাণও যথেষ্ট।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বিহারের উল্লেখ করা যেতে পারে। ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র স্বতন্ত্র পার্টি যে কংগ্রেস-প্রভাবিত বিহারে দেখতে দেখতে এমন বিরাট হয়ে উঠছিল, পর্যবেক্ষকেরা বলেন—তার একমাত্র কারণ—রামগড়ের রাজার নেতৃত্ব। রাজা জাতিতে—ভূমিহার তথা রাজপুত। রাজ্যের জনসংখ্যার একটা বিপুল অংশও তাই। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ছিলেন কায়স্থ সেইহেতু মনে মনে হীনমন্যতায় পীড়িত ছিলেন তাঁরা। সুতরাং হোক না ভিন্ন পতাকা হাতে, রাজা বাহাদুর যেই-মাত্র আসরে নামলেন সেইমাত্র চঞ্চল হয়ে উঠল রাজ্যের রাজপুত-কুল।

শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মৃত্যুর পর দেখা গেল লড়াই শুধু 'কলমে' আর 'গোঁফে' নয়—যুদ্ধটা অন্যদের মধ্যেও অঘোষিত অবস্থায় চালু ছিল। সে প্রমাণ পাওয়া গেল বিনোদানন্দ ঝাকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের ভেতরে মৈথিলী আর ভোজপুরী আদর্শবাদীদের কোন্দলে।

যেমন বিহারে তেমনি রাজস্থানে এবং অন্যত্র। রাজস্থানে স্বতন্ত্রের বলবৃদ্ধির কারণ—রাজপুত এবং জাঠদের পরম্পরাগত প্রতিযোগিতা এবং গুজরাটে জমিদারী উচ্ছেদজনিত কারণে ভূস্বামী শ্রেণী পাতিদারদের ক্ষোভ। বর্ণ রাজনীতিক্ষেত্রে কত বলবান হতে পারে এই রাজ্যের মতিগতি তার একটা উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। বাংলা

দেশে ব্রাহ্মদের মত এই শতকের গোড়ার দিকে গুজরাটের যাবতীয় রাজনৈতিক এবং সামাজিক কর্তৃত্ব ছিল শহরবাসী তিনটি অগ্রসর শ্রেণীর হাতে। তারা যথাক্রমে নাগরা, ব্রহ্মক্ষত্রিয় এবং কায়স্থ। ক্রমে সামাজিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের প্রতিযোগী হিসেবে আবির্ভূত হলেন—পাতিদার এবং অনাউইলরা (Anawil)। এতকাল তাঁদের লড়াই ছিল পূর্বোক্ত তিন বর্ণের বিরুদ্ধে। আপাতত চলছে নিজেদের মধ্যে।

উদাহরণ আর বাড়িয়ে লাভ নেই। অনেকেই জানেন, কেরলে রাজনৈতিক ভারসাম্য যাঁরা রক্ষা করেন তাঁরা দিশি খৃষ্টান, কিন্তু অনেকেই জানেন না, চ্যবণ যদি জাতিতে খাঁটি মারাঠী না হতেন, কিংবা কামরাজ যদি নাদারকুলের সন্তান না হতেন তাহলে হয়ত—আজ যেখানে তাঁরা এসে পৌঁছেচেন, ঠিক সেখানে আসতে পারতেন না। তাছাড়া, যদি শ্রীজগজীবনরাম 'ডিপ্রেসড ক্লাস লীগের' প্রতিষ্ঠাতা না হতেন এবং পার্লামেণ্টে ও লবীতে যদি বিস্তর মানুষ অন্যতর জাতির হতেন তাহলেও কি তিনি ডেপুটি-লীডারের পদ-প্রার্থী হিসেবে নিজেকে ভাবতে পারতেন? অনেকেরই 'সন্দেহ' আছে।

অতঃপর বলা নিষ্প্রয়োজন 'চতুরাশ্রম' বলতে যে সমাজবিন্যাস একদিন এদেশে ছিল আজ তা সেভাবে নেই। অন্তত ক্ষমতা যে ইতিমধ্যে বিস্তর ভাগাভাগি হয়ে গেছে এবং যাচ্ছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বছর দুই আগে স্যোসালিস্ট পার্টির প্রধান শ্রীমাধু লিমায়ে এ সম্পর্কে একটি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য পরিবেশন করেছিলেন। তাঁর মতে ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে একটা বিপুল অংশ জুড়ে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব শেষ হয়ে 'শূদ্রের যুগ' শুরু হয়েছে। কেননা সমসাময়িক বিজয়ী এবং পরাজিতের তালিকাটা এই ধরনের :—

বর্তমান নায়ক	স্থানচ্যুতগণ
কাইরন	ভার্গব
সুখাদিয়া	শাস্ত্রী
কুম্ভারম	ব্যাস
চ্যবণ	খের
নাদার	দেশাই
রেড্ডি	চক্রবর্তী
জেটি	প্রকাশম, দিবাকর ইত্যাদি

উল্লেখযোগ্য, যাঁরা এলেন তাঁরা প্রত্যেকেই যেমন 'শূদ্র' তেমনি যাঁরা গেলেন তাঁরা প্রত্যেকেই 'ব্রাহ্মণ'। স্যোসালিস্ট নেতা হাঁফ ছেড়েছেন—'পণ্ডিত-লালা'র দিন তবে শেষ হল। খেদ করেছেন—'তবে হায়, গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের দেশে এখনও নেহরু-পন্থ-চালিহা-রায় এবং সিংহরাই বহাল রইল!'—অবশ্য তাঁদেরও—'দিন আগত ঐ!'

প্রশ্ন ঃ কৌটিল্যকে অবহেলা করে, মনু-যাজ্ঞবল্ক্যকে ডিঙ্গিয়ে এই সনাতন দেশে এ ঘটনা কি করে সম্ভব হচ্ছে? কুল-মহিমায় এখন যাঁরা আস্থাবান তাঁরা হয়ত উত্তরে সেই গেঁয়ো প্রবাদটি আওড়াবেন যার মর্ম ঃ 'তলের মহম্মদ উপরে যায়, কপাল ফেরে যদ্দিন'।

বলা বাহুল্য ব্যাপারটা সত্যিই অনেকখানি কপাল নিয়ে। কলকাতার একজন বিশিষ্ট অব্রাহ্মণ ধনাঢ্য একবার সগর্বে মন্তব্য করেছিলেন—'জাত আমার বাক্সের ভেতর।'

স্পষ্টতই সেটা অর্থবলের ইঙ্গিত। কিন্তু সেই বল কি শ্রেণী হিসেবে লটারীতে লভ্য? সেইখানেই আসে যুগ-যুগান্তের লড়াইয়ের কথা। শুরু হয়েছিল নিশ্চয় মনুর কালেরও আগে, তারপর জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বিশিষ্টের সঙ্গে বিশিষ্টের সেই বিরামহীন লড়াই যুগ-যুগান্ত ধরে চলেছে। কখনও বিত্তের ক্ষেত্রে, কখনও শিক্ষার ক্ষেত্রে। কখনও মন্দিরের অঙ্গনে কখনও দরবারে। একের পর একটি দুর্গ ভূমিসাৎ হয়ে যাচ্ছে। হাতে নেতৃত্ব আসছে, হক

না আইন বলে,—দিকে দিকে দরজায় করাঘাত পড়ছে। বাধ্য হয়ে এককালের ক্ষমতাবান পরাজয় স্বীকার করে নিচ্ছেন, একের পর এক খুলে দিচ্ছেন দরজা, দেউড়ি। কিন্তু হায়, সব সদরের। অন্দরে তথা অন্তরে এখনও সেই রঘুনন্দন কিংবা মনুস্মৃতি। ফলে যদিও আদর্শে 'বিজ্ঞাননিষ্ঠ' সাম্যবাদী তবুও ভোটের দিনে কানে-কানে কুলের কথা ওঠায় হিন্দু কোড বিলের সমর্থনে হাত তুলতে গিয়ে পা কাঁপে এবং দিল্লীর চারপাশ ঘিরে একটা জাঠ রাজ্য সত্যিই গড়ে তোলা যায় কিনা একথা নিয়ে আলোচনা একেবারে মন্দ লাগে না। বলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধার কারণ নেই, বিচ্ছিন্নতা তথা আজকের ভারতের যে সব রোগলক্ষণ তার অনেকখানিই এখানে,—এই বন্ধ অন্দরে। পরাজয় শিরোধার্য হয়ে গেছে। এখন সমস্ত শক্তি সমবেত—শেষ দুর্গে, অন্দরে।

যেমন এখানে-ওখানে বিবিধ প্রবীণা শক্তির আকস্মিক পুনরু-থ্থানে সে খবর কিছু কিছু পাওয়া যায়, তেমনি বোঝা যায় টেবিলে ছড়ানো যেকোন সংবাদপত্র দেখেও। 'পাত্র-পাত্রী সমাচার' কি এ খবরটাই দেয় না যে, 'রোটি আউর বেটি' ঘিরেই আজ আমাদের 'লাস্ট ডিচ' লড়াই চলেছে?

অবশ্য সব হারিয়ে অবশেষে যোদ্ধা যখন শুধু বংশলতার আড়ালে আশ্রয় নিয়ে বাঁচতে চান, ফলাফলটা কি দাঁড়াতে পারে, তার ইঙ্গিতও আছে সংবাদপত্রের পাত্রপাত্রী সমাচারের মধ্যে কিছু কিছু আছে।

বহু বিজ্ঞাপনের মধ্যে আত্মগোপনকারীর দুই-একটির একটি :

"অসবর্ণে আপত্তি নাই। মুখার্জি (২৪), পাত্রী উজ্জ্বল গৌরবর্ণা, দর্শনশাস্ত্রে এম-এ পাঠরতা।'

'সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুশিক্ষিত পাত্র চাই। অসবর্ণে আপত্তি নাই।'

সব বিষয়ে ছেলেটি যদি সত্যিই সুপাত্র হয়, তবে আশা করি কায়স্থ বলেই মুখার্জীবাবুর আত্মীয়রা আপত্তি তুলবেন না। কেননা, তাতে ভারত নামক আপনাদের প্রিয় দেশটির কোন গৌরববৃদ্ধি হবে না। উপকার ত নয়-ই নয়।

নিরুপমার স্মরণে

"...বড় মানুষের ছেলে, দেখতে, শুনতে, বলতে কইতে যেমন হতে হয়। পাড়া-জোড়া বাড়ী, আস্তাবল-ঘোড়া গাড়ী...। আইরিন্ চেস্টে কোম্পানীর কাগজ রাখতো, ঘরে আইরিন চেস্টে কাগজ ধল্লোনা, তাই বাঙ্গালবেঙ্কে সাতগাড়ী কাগজ রেখে দিয়েচে। ছেলে ত রাজপুত্তুর, বয়সে সবে এই আঠার বছর। হিন্দুকালেজে ফোর্ত্ত কেলাসে পোড়তো।...

...ওদের ত আর অভাব নেই, টাকা কড়ি তত চায়না; তিন হাজার ভরি সোণা, সোণা-রূপোর আটপ্রস্থ দানসামগ্রী, সহরের ভেতর একখানা বাড়ী—সাজিয়ে গুচিয়ে অবশ্যই দিতে হবে—সহরের কাছে একটা বাগান। আর এমন বেশী কি? পঞ্চাশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ! গহনার কথা বেশী আর না বল্লেও চলে, তবে জড়াও ছুস্মুট' তা ত দিতেই হবে। ছেলের আংটি ঘড়ী সে তোমাদের বিবেচনা।..."

('বরের বাজার'—ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

"...গিন্নি!—এ যে দিয়ে থুয়ে কিছু থাকে, এমন তো বোধ হয়না!

গিন্নী। হু' হু' গুরুর কথা না শোন কানে, প্রাণ যাবে তোমার হ্যাঁচকা টানে; —আমিতো বলেছিলুম, অত কমে রাজী হইও না; নন্দলাল কি আমার চার হাজারের?...

গোপী। কি জান, এই দিতেই তাদের সর্বনাশ হবে।

গিন্নী।—তাদের সর্বনাশ হল তো আমার কি! আহা কি আমার সাত পুরুষের কুটুম গো! নন্দলালের পায়ে মেয়ে দেবে, তাদের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে...মেয়ের মা—চোখ-খাগীর জামাইকে দিতে চোখ টাটায়,—গায়ে গয়না নেই? বেচুক না!

গোপী। আমি একটা ঠাউরে আছি, আগে সব ঠিক হয়ে যাক না,—নন্দকে আড়ালে শিখিয়ে দেব এখন—সম্প্রদানের সময় একটা কোট করে বসবে।

গিন্নী। আচ্ছা, এবার তুমি কোচ্ছ কর, আমি হাত দেবনা ঃ কিন্তু বছরের ভেতর বৌটার যদি ভালমন্দ হয়—নন্দর তদ্দিনে পাশ বাড়বে—দেখো দেখিন—তখন ছেলের ফে বিয়ে দিয়ে আমি দোতলা বাড়ী আর নিজের গা ভরা গয়না কোর্ত্তে পারি কিনা।"

('বিবাহ বিভ্রাট'—অমৃতলাল বসু)

"শুক বলে, আমার কৃষ্ণ
রোজগারী ছেলে ;
সারী বলে, আমার রাধায়
গয়না দিবে বলে,
—নৈলে রোজগার কিসের লাগি ?
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের
চশমা শোভে নাকে ;
সারী বলে, আমার রাধায়
খুঁটিয়ে দেখবার পাকে,
—নৈলে পরবে কেন ?"

('শুক-সারী সংবাদ'—অক্ষয়চন্দ্র সরকার)

* * * * *

পুরানো এই কাহিনী কি আজ ইতিহাস ?

"—কার্তিক মাসের হিমের সময় সমস্ত রাত মাথার দরজা খোলা, শীতের সময় গায়ে কাপড় নাই। আহারের নিয়ম নাই। দাসীরা যখন মাঝেমাঝে খাবার আনিতে ভুলিয়া যাইত, তখন যে তাহাদের একবার মুখ খুলিয়া স্মরণ করাইয়া দেওয়া, তাহাও সে করিত না। সে যে পরের ঘরের দাসী এবং কর্তা-গৃহিণীদের

অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া বাস করিতেছে, এই সংস্কার তাহার মনে বদ্ধমূল হইতেছিল।...

"...রোগ গুরুতর হইয়া উঠল তখন শাশুড়ী বলিলেন—'ও'র সমস্ত ন্যাকামি।' অবশেষে একদিন নিরু সবিনয়ে শাশুড়ীকে বলিল—'বাবাকে আর আমার ভাইদের একবার দেখব, মা।' শাশুড়ী বলিলেন—'কেবল বাপের বাড়ি যাইবার ছল।'

"কেহ বলিলে বিশ্বাস করিবে না—যেদিন সন্ধ্যার সময় নিরুর শ্বাস উপস্থিত হইল, সেইদিন প্রথম ডাক্তার দেখিল এবং সেইদিন ডাক্তারের দেখা শেষ হইল।..."

নিরুকে আপনারা চেনেন। বাংলা দেশের প্রত্যেকে। তার ভাল নাম—নিরুপমা। পাঁচ ছেলের পর যখন এক কন্যা জন্মিল তখন বাপে-মায়ে অনেক আদর করিয়া তাহার নাম রাখিলেন—নিরুপমা। এ নিরুপমা 'দেনাপাওনার' সেই নিরুপমা। সেই, যে মেয়েটি, বাবা বাড়ি বিক্রি করে বকেয়া পণের টাকা দিতে এসেছেন শুনে নারীত্বের মর্যাদা রক্ষার্থে তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে নিজে মৃত্যুবরণ করেছিল, সেই যাকে 'চন্দনকাষ্ঠে' মহাসমারোহে দাহ করা হয়েছিল এবং যার মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে রায়বাহাদুর-মহিষী প্রবাসী পুত্রকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন—"বাবা, তোমার জন্যে আর একটি মেয়ের সম্বন্ধ করিয়াছি, অতএব ছুটি লইয়া আসিবে।...এবারে বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়"—সেই নিরুপমা। রবীন্দ্রনাথের নিরু, বাংলাদেশের নিরুপমা!

নিরুপমা মারা গিয়েছিল সম্ভবত বাংলা ১২৯৮ সালে কিংবা তারও আগে। এটা ১৩৬৯ সাল। আর মাত্র উনত্রিশ বছর পরে নিরুপমার শতবার্ষিকী—কে জানে হয়ত বা সহস্রবার্ষিকী। কবিগুরুর শতবার্ষিকী সমাপ্তি উৎসবের বছরে আজ তাই বিশেষ করে মনে পড়ছে এই হতভাগিনী মেয়েটির কথা। রামসুন্দর

মিত্রের একমাত্র কন্যা নিরুর কথা,—বাংলাদেশের, ভারতের নিরুপমাদের কথা।

একাত্তর বছর পরে আবার ঘুরে এসেছে কার্তিক মাস। সামনেই অগ্রহায়ণ। তারপর একমাস ছুটির পরেই মাঘফাল্গুন, ইতিমধ্যেই চারদিকে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। ভাবিত রামসুন্দররা সন্ধানে নেমেছেন, 'রায়বাহাদুরের' তত্ত্ব-তল্লাসে আছেন। সন্দেহ নেই, প্রজাপতি নির্বন্ধ যদি থাকে তবে আগামী এই তিনমাসে নিরুপমার বিয়ে হবে।—কিন্তু 'দেনাপাওনা'?—সেই মামলার কি মীমাংসা হবে?

মিথ্যে বলব না, রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর অন্তে এ-বছরে নিরুপমার নামে মীমাংসা একটা খাতায়-কলমে সত্যি সত্যিই লেখা হয়েছে। ১৯৬১ সালের ১লা জুলাই শনিবার সেই আইন সাড়ম্বরে ভূভারতে চালুও হয়েছে। তদনুযায়ী অতঃপর কোন রামসুন্দরের আর কিছু ভাববার নেই। কেননা, কোন রায়বাহাদুরের সাধ্য নেই তিনি দশ হাজার টাকা পণ দাবি করেন। এমনকি দশ টাকাও না! যদি করেন, তবে তিনি আর 'রায়বাহাদুর' থাকছেন না। খেতাব তাঁর ঘরে থাকবে, তিনি কয়েদ খাটবেন!

মাসের পর মাস জেলে কাটাতে হবে তাঁকে। চাই কি একনাগাড়ে ছয় মাস। তদুপরি, রামসুন্দর যদি তেমন হন তবে উল্টো 'পণ'ও আদায় করতে পারেন তাঁর থেকে। সে 'মুক্তিপণ'। রায়বাহাদুর ছাড়া পেতে চান, তবে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে তাঁকে! কপাল মন্দ থাকলে,—তদুপরি আবার জেলটাও খাটতে হবে।

উত্তম মীমাংসা। শুনলে মনে হয়—যাক, এতদিনে চন্দনকাঠের সেই দাউ দাউ আগুনটা তবে নিভল,—এতদিনে বুঝি নিরুর আত্মার শান্তি হল!—কিন্তু তাই কি? রামসুন্দররা কি বলতে পারেন—একথা সত্যি।

হো হো হাসবেন রায়বাহাদুর, 'দূর, তাও কি কখনও হয়!'

হয় না। কার্তিকের মাঝামাঝি বসে অগ্রহায়ণের যে পূর্বাভাষ পাচ্ছি, তাতে আমাদেরও তাই ধারণা।—না, নিরুপমা এখনও হাসছে না। তার মৃত্যুর একাত্তর বছর পরেও না, তার নামে—এমন ঘটা করে আইন পাশ করার পরেও না।

নিরুপমা আজও তেমনি কাঁদছে। আইন পাশ হওয়ার তিনমাস পরেও।

বিশ্বাস না হয়, গেল রোববারের কাগজটা খুলুন। 'পাত্র-পাত্রী' স্তম্ভটা একবার দেখুন। গলায় চাদর জড়িয়ে করজোরে দাঁড়িয়ে আছেন রামসুন্দর। সারির পর সারি রামসুন্দর। পায়ের উপর পা রেখে, মুখে বিজয়ীর হাসি মেখে তক্তপোশে হেলান দিয়ে পান চিবোচ্চেন রায়বাহাদুর,—রায়বাহাদুরগণ। তাঁদের কারও পুত্র ইঞ্জিনীয়ার, কেউ আই-এ-এস, কেউ ক্লাস ওয়ান (সেন্ট্রাল) কেউবা উপস্থিত 'কার্যোপলক্ষে বিলেতে' আছে, কেউ বা সেখানে যেতে চায় যদি 'অগ্রহায়ণেই উপযুক্ত পাত্রীর' সন্ধান মিলে যায়!

গেল তিনমাসে বিজ্ঞাপনের ভাষায় পরিবর্তন হয়েছে। 'পণ' 'দাবি' 'যৌতুক' 'দানসামগ্রী' ইত্যাদি শব্দগুলো আজ সত্যিই অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিন্তু বলা বাহুল্য, তবুও সেগুলো দৃশ্যমান। অন্তত রামসুন্দরের চোখে। কারণ, রায়বাহাদুর, তাঁকে বাড়িতে ডেকে পাঠাননি—তিনি তাকে 'ফটো সহ' দরখাস্ত করতে নির্দেশ দিয়েছেন কি একটা আপিসে। সে আপিসের নাম—'হানিমুন' ঠিকানা…বাই লেন!

তারপরও কি কান্না ছাড়া আর কিছু সম্ভব নিরুপমার পক্ষে? ওর আমলেও ঘটক ছিল। কিন্তু এমন নির্দয়তা ছিল না সমাজে। গলিতে গলিতে পাঁচ দশ টাকা প্রণামী দিয়ে মেয়ের ফটো জমা দিতে হত না রামসুন্দরদের। নিরুপমার

বিয়ে সেভাবে ঠিক হয়নি। রায়বাহাদুর নিজেই দাবির কথা উত্থাপন করেছিলেন।—এজেণ্টের মাধ্যমে নয়!

অথচ আজ তাই হচ্ছে।

গলিতে গলিতে যে শুধু চেয়ার-টেবিল সাজিয়ে এজেণ্ট বসে গিয়েছে তাই নয়, তাদের ওখানে ভিড়ও বেড়েছে। এবং খোঁজ নিয়ে (কথাবার্তার ভঙ্গী দেখাই যথেষ্ট) দেখা গেছে আয়ও তাদের বিলক্ষণ বাড়ছে; কেননা, দেশে কাড়াকড়ি আইন। এমন অবস্থায় আদায়ের ঝক্কি-ঝামেলা বেশী! স্বভাবতই 'ফি'-এর জায়গায় এখন এসেছে 'কমিশন' এবং কথায় কথায়—নানাবিধ শাসন! কেননা, 'হানিমুন'-এর চন্দ্রাধিপ যিনি তিনি জানেন রামসুন্দর আইন পড়েন না।

কিন্তু রায়বাহাদুর পড়েন। কারণ, চিলে কান নিয়ে গেছে শুনে যারা চিলের পেছনে ছোটে তিনি সে ধরনের মানুষ নন। ছেলেটাকে সত্যিই তিনি কারও পয়সায় বিলেতে পাঠাতে চান।

এই অগ্রহায়ণেই অনেক ছেলে তা যাবেন। কারণ, আইনের কোথায় কি ফাঁক গেল তিন মাসে তা সকলের মুখস্থ হয়ে গেছে। ওঁরা বই না খুলেই এখন বলতে পারেন—সংজ্ঞার পরেই যে প্যারাটা সেখানে লেখা আছে:

"...for the the removal of doubts it is hereby declared that any presents made at the time of marriage to either party to the marriage in the form of cash, ornaments, clothes or other articles shall not be deemed to be dowry within the meaning of this section unless they are made as consideration for the marriage of the said parties."

সুতরাং—

সুতরাং, বেচারা রামসুন্দর! তিনি কখনও আইনের কথা

তোলেন না, কোথাও না। তিনি ভীরুর মত আইনসম্মত ভাষায় খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেন, তিনি ভীরু পায়ে 'বিবাহ কার্যালয়ে' প্রণামী দিয়ে ফটো জমা দেন এবং রায়বাহাদুরের সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র করজোড়ে 'কত না দিলে একেবারেই নয়,' তাই জানতে চান।

নিরুপমা এ খবর জানে। জানে বলেই সে এখনও কাঁদে।

শুধু কাঁদে নয়, কাঁদায়ও। কখনও ওর তরুণ দেহটাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে জননী গঙ্গা কাঁদেন, কখনও হাউ হাউ করে কাঁদে চন্দন কাষ্ঠের শিখা, কখনও ওর নরম গলা বেয়ে নামতে নামতে কাঁদে তরল নাইট্রিক এসিড, কখনও তুলো হতে পারল না বলে কাঁদে পাষাণের জমি,—ফুটপাথ! পুলিস কাঁদে, জজসাহেব কাঁদেন, উকিল কাঁদেন, খবরের কাগজ কাঁদে—ওর শোকে গোটা দেশ কাঁদে। কিন্তু আশ্চর্য! এ কান্না আজও তবু থামল না। নিরুপমা আজও হাসল না!

গুজরাটে এখনও নাকি প্রতিদিন গড়ে একটি করে নিরুপমা আত্মহত্যা করে। গেল বছর হিসেব হয়েছিল। জানা গেছে, আসল সংখ্যাটা কম—একশ' পঞ্চাশ!

বাংলাদেশে হিসেব নেই। হয়নি। এবার থেকে করবেন। দেখবেন, আমরাও খুব পেছনে নেই! যদি থাকতাম তাহলে আজও এমন কথা শোনা যেত না।

প্রথম সন্তান।

সকলে ছেঁকে ধরেছে।—কি আনন্দ, কি আনন্দ!—খাওয়াতে হবে।

রামসুন্দর কপালে করাঘাত করলেন—'সে কপাল কি আছে! —মেয়ে হে,—মেয়ে।'

এই রামসুন্দর সুশিক্ষিত কেরানী। এবং তাঁর কন্যাটি ভূমিষ্ঠ হয়েছে ১৯৬১ সালে ১লা ফেব্রুয়ারীর অনেক পরে, গেল মঙ্গলবার।

শুধু কি তাই ?

শোনা গেল কলকাতার একটা বিশেষ নার্সিংহোমে ভিড় নাকি লেগেই থাকে।

—কারণ ?

'—কারণ', ডাক্তার হেসে বলেছিলেন—'সে আমার ভাগ্য ! চতুর্দিকে নাকি রটে গেছে আমাদের এটি নাকি খুব 'পয়া' নার্সিংহোম।—এখানে এলে অধিকাংশ মা-ই নাকি ছেলে কোলে ঘরে ফেরেন।'

তারপরও কি বলতে হবে,—নিরুপমা কেন এখনও হাসে না !

নিরুদ্দিষ্ট মানুষগুলো কোথায় যায় ?

"খোকন, ফিরিয়া আইস। তুমি যাহা ইচ্ছা করিয়াছিলে তাহাই হইবে। টাকার দরকার হইলে সত্বর জানাও।..."

* * *

"রমেন, মা মরণাপন্ন। ভয় নাই। ঠিকানা জানাও।"

* * *

"রামনন্দন সরকার নামে একটি ৯ বৎসরের বালক..., ফুলপ্যান্ট ও ফুলশার্ট, রং ফরসা। বাঁ গালে কাটার দাগ। ২৮শে এপ্রিল স্কুলে গিয়া আর ফিরে নাই।"

* * *

"...আমার জ্যেষ্ঠতাত..., বয়স ৫১, মাঝারি গড়ন।...চোখে চশমা। মাথায় ছিট আছে..."

* * *

"গত...তারিখে আমার স্ত্রী শ্রীমতী...(২২) নিরুদ্দেশ। গায়ের রং শ্যামবর্ণ। স্বাস্থ্যবতী। চুল লম্বা। পরিধানে ছাপের শাড়ি।..."

* * *

"স্বপ্না অবুঝ হওয়ার কোন মানে হয় হয় না। চিঠির স্ট্যাম্প পড়া গেল না। আশঙ্কা অহেতুক। তোমার সম্বন্ধে যাহা করণীয় তাহা অবশ্যই করা হবে। মেঝদির সঙ্গে দেখা করো।..."

* * *

"চন্দ্রাবতী চক্রবর্তী (৪১) স্বাস্থ্য ভাল, লম্বা ৫॥ ফুট, ফর্সা। গত ২৪-৫-৬২ তারিখে হাওড়া আসিবার পথে নিরুদ্দেশ। সঙ্গে টাকা পয়সা বা অলঙ্কারাদি ছিল না ...কেহ সন্ধান দিতে পারিলে পুরস্কৃত করিব।"

* * *

"হরেন্দ্র যেখানেই থাক কুশল সংবাদ জানাও। বৌমা অন্নজল ত্যাগ করিয়াছেন।..."

*　　　　*　　　　*

"...দত্ত। উচ্চতা—৫´-৩"। পরণে ধুতি, শার্ট, বাঁকা সিঁথি। চোখে চশমার দাগ। অষ্টমীর দিন হইতে নিখোঁজ। সন্ধান দিলে বাধিত হইব..."

*　　　　*　　　　*

"হরিপদ ভট্ট। বয়স ৬৮। চুল আধাপাকা-আধাকাঁচা, গত ১১ই জুন বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়াছেন। হাতে বেতের লাঠি... গলাবন্ধ কোর্ট। সন্ধান দিলে পুরস্কৃত করিব।"

*　　　　*　　　　*

ভাবতে পারেন, প্রতিদিন গড়ে কমপক্ষে পনেরজন মানুষ নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছে শুধু এই কলকাতা থেকে? জানালায় জানালায় গরাদ দেওয়া, দরজায় দরজায় নম্বর আঁটা, ইট-কাঠ-পাথরের এই খাঁচা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে পনেরটি নারী, শিশু, বৃদ্ধ, গৃহস্থ? পনেরজন—খোকা-খুকু, সাবিত্রী-সুলোচনা, পনের জন রামবাবু? পারেন না। অথচ ঘটনাটা সত্য। যতখানি এই-মাত্র বলা হল তার চেয়েও বেশী সত্য। পুলিসের কাছে খবর করুন শুনবেন, বছরে গড়ে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার মানুষকে খুঁজে-পেতে ঘরে ফেরান তাঁরা। তারপর আছে খবরের কাগজের হারান-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ স্তম্ভ এবং ব্যক্তিগত সাধন-ভজন, খোকার খোঁজে হন্যে হয়ে উন্মাদিনীর বেশে মায়ের নগর-পরিক্রমণ, খুকীর খোঁজে বাবার দেশভ্রমণ!

বলা নিষ্প্রয়োজন তবুও সব খোকার সন্ধান মিলে না। সব খুকী আবার মায়ের কোলে ফিরে আসে না এবং সব স্ত্রী রামকানাইকে আবার সংসারের মায়াজালে ফেরত পায় না! প্রশ্ন সেখানেই, এই হারিয়ে-যাওয়া মানুষগুলো কোথায় তাহলে যায়, আর কেনই বা যায়?—সে কোন নিশির ডাকে?

সাড়ে পাঁচ হাজার মানুষের নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার কারণ নিশ্চয়ই এক নয়। হেমলিনের সেই বাঁশীওয়ালা নিশ্চয় কলকাতায়ও সকলের কানে এক সুর বাজায় না, নিশি এক নামেই সকলকে ডাকে না। যদি ডাকত, তবে তের বছরের কিশোরী লক্ষ্মীমণির মত তেষট্টি বছরের প্রবীণ হেডক্লার্ক হরিবিলাসবাবু নিশ্চয় তাতে সাড়া দিতেন না।

অদ্ভুত ঘটনা। অনেকটা সেই বিখ্যাত ব্রিটিশ ব্যবসায়ী ফ্রেডারিক লয়েডের মত। তবে লয়েড নিউইয়র্কে নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন (১৯৩৭) স্ত্রী, কুড়ি ভৃত্যের প্রাসাদ এবং পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডের জোতজমা রেখে, আর হরিবিলাস হয়েছিলেন একঘর ছেলেমেয়ে আর একটি শূন্য মনিব্যাগ পেছনে রেখে। হয়ত শুধুমাত্র ঐ মনি-ব্যাগটির জন্যেই অফিস থেকে আর বাড়ি ফেরেননি তিনি। হয়ত শুধুমাত্র দারিদ্র্যের লজ্জায়, কেবলমাত্র অক্ষমতার পীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে সংসার থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে।

এক্সপ্রেস ট্রেনে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় ঠিক আপনার উল্টো দিকে বসে যে মানুষটি ইংরেজী খবরের কাগজ পড়ছেন, চেহারা এবং পোশাক দেখে একবার মনেও হয় না তাঁর কোন অভাব আছে, কোন লজ্জা আছে, কিংবা এই দামী কোটটির নীচে কোন দুঃখ আছে! কিন্তু আশ্চর্য, আপনি জানেন না তবুও আজ সাত দিন ধরে ওঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! কালকের কাগজের নিরুদ্দেশ কলমে একবার চোখ বুলাবেন, দেখবেন সেখানে এই মানুষটির ছবি ছাপা হয়েছে। মুখটা দেখে তখন আর আঁতকে উঠে লাভ নেই। কারণ, আপনার স্পষ্ট মনে আছে গতকাল মোগলসরাইয়েই উনি নেমে গেছেন।

—কেন নেমে গেলেন উনি? তেতলা বাড়ী, সুন্দরী স্ত্রী, ক্রমোন্নত ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স—সব কিছুর মায়া কাটিয়ে এমন করে কেন

নেমে গেলেন ইনি রুক্ষ, অচেনা পৃথিবীতে। সে কি তবে আরও উন্নততর, আরও সুন্দরতর কোন পৃথিবীর খোঁজে? অথবা, অন্য কোন কারণে?

কারণ অনেক কিছুই হতে পারে। ঘরের চেয়েও রূপসী কোন মায়াবিনী হয়ত হাতছানি দিয়েছিল ওঁকে, হয়ত অন্তরীক্ষে ব্যবসায়ে এমন কোন ফাটল আবিষ্কৃত হয়েছিল মাত্র দিন দুই আগে যার কাছে ব্যাঙ্কের খাতাটা নিতান্তই হাস্যাস্পদ প্রমাণিত হত, হয়ত তার চেয়েও গুরুতর এমন কিছু ঘটেছিল ঐ সবল হাতগুলোর দুর্বল মুহূর্তে যা প্রমাণিত হলে স্বর্গ থেকে পতন অবধারিত ছিল। হয়ত, এত সবের কোনটাই না, নেহাতই বৈরাগ্য। সিদ্ধার্থ থেকে লালাবাবু এত মানুষের পক্ষে যা সম্ভব হয়েছিল কেন তা অসম্ভব ভাবব জনৈক কোম্পানি ডিরেক্টার, একটি গাড়ির মালিকের ক্ষেত্রে? অবশ্য এমনও হতে পারে ওঁর মাথাটাই হয়ত বেঠিক ছিল। কে না জানে, ব্যাকব্রাস করা চুলের নীচেও উন্মাদনা কখনও কখনও ঘর করে। নয়ত ভিক্টর গ্রেসন-এর মত জনপ্রিয় জননেতা হারিয়ে যাবেন কেন?

বিভান বিভান হওয়ার তিরিশ বছর আগে গ্রেসন ছিলেন লেবার পার্টির বিভান। যেমন বক্তা, তেমনি লেখক। সেবার ইলেকসানে হেরে গিয়ে গ্রেসন কেমন যেন মনমরা হয়ে গেলেন। তিনি সাংবাদিক হলেন। সাংবাদিক গ্রেসন সেদিন একটি হোটেলে ঢুকলেন। বেয়ারা এসে সেলাম করে সামনে দাঁড়াল। গ্রেসন অর্ডার দিলেন। গ্লাস নিয়ে বেয়ারা ঘরে ঢুকে দেখল, তিনি নেই। গ্রেসন সেই থেকেই নিরুদ্দেশ। আজও খুঁজে পাওয়া যায়নি তাঁকে। বেঁচে থাকলে এখন তিনি আশি বছরের বৃদ্ধ। আর হরিবিলাসবাবু? এতদিনে তাঁর চুলগুলো হয়ত সবই পেকে গেছে। সামনের সেই নড়বড়ে দাঁত দুটো নিশ্চয় পড়ে গেছে।

খুকী—আমাদের পাড়ার খুকীদিরও এত দিনে নিশ্চয় কোথাও

না কোথাও ঘর হয়েছে। মানুষের ঘরে থেকে থাকলে নিশ্চয় খুকীদি ছেলেমেয়েরও মা হয়েছে। হবে না? সে কি আজকের কথা? খুকীদি নিরুদ্দিষ্ট হয়েছিল সেই দাঙ্গার সময়ে। কেউ কেউ নাকি ওর চিৎকার শুনেছিল। শুনেছিল 'আমাকে বাঁচাও' 'আমাকে বাঁচাও' একটা বিলাপ হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে ক্রমে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। লাহোরে হারান-প্রাপ্তির সেই কালো বোর্ডটায় আজও নাকি লেখা আছে বাংলা দেশের কোন এক খুকীর নাম। জমানার পর জমানা এল গেল—কিন্তু খুকীদি আজও দেশে ফিরল না। তবে কি বেঁচে নেই সে?

খুকীদির মত যারা হারিয়ে যায় সাধারণত তারা মরে না। দুশমনরা মরবার সুযোগ দেয় না। কেননা, পণ্য হিসেবে ওরা মূল্যবান। গেল বছরও এই পশ্চিমবঙ্গ থেকে অপহৃত হয়েছে আটশ' মানুষ। শুধু কলকাতা থেকেই ছোঁ মেরে দুশ' মানুষ তুলে নিয়ে গেছে মানুষধরা বাজেরা। অধিকাংশই তাদের নারী। শিশু, কিশোরী, তরুণী, জননী।

ওঁরা কিভাবে গেলেন? আইন-আদালতে কখনও কখনও কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায় তার। যেমন,—

মাস কয় আগে কলকাতার আদালতে একটা মামলা উঠেছিল। তাতে জনা কয় রামসিং হনুমান সিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তারা কলকাতা থেকে তিনটি বাঙ্গালী মেয়েকে বিহারে নিয়ে বিক্রি করেছে!

কখনও বাঙ্গালী মেয়ে আরও উত্তরের হাটে বিক্রি হয়, কখনও বা বিক্রি হয়ে যায় কলকাতার বাজারেই। কেননা, সব দেশের মত এদেশেও 'শ্বেতদাসী'দের জন্য আজ অবারিত বাজার!

মাত্র দিন কয় আগে এমনি একটি বেচাকেনার খবর বের হয়েছে খবরের কাগজের পৃষ্ঠাতেই। মামলাটি এখনও বোধ হয় চলছে। তার সার মর্ম—পাঁচ বছর আগে লক্ষ্মীমণি নামক যে আট বছরের

উদ্বাস্তু মেয়েটি কোল থেকে হারিয়ে গিয়েছিল, পাঁচ বছর পরে দুঃখিনী মা আবার তাকে ফিরে পেয়েছে। হাত-ফিরি হতে হতে সে মেয়ে অবশেষে পুলিসের হাতে এসে পৌঁছেছে।

ক'মাস আগে এর চেয়েও চাঞ্চল্যকর একটা মোকদ্দমা উঠেছিল এই কলকাতার কোর্টেই। দীর্ঘ ন' বছর পরে কৌতূহলবশত আদালতে উঁকি দিয়ে গিয়ে বাবা সেদিন হারানো ছেলেকে আবিষ্কার করেছিলেন কোর্ট-ঘরে! ছেলেধরার জঠর থেকে বালকটি সবে মুক্ত হয়েছে। এমনও হয়? আনন্দে বাবা কাঁদতে কাঁদতে সেখানেই মূর্ছা গিয়েছিলেন!

নমুনা হিসেবে এ ক'টা কাহিনীই যথেষ্ট। সারমর্ম হিসেবে যা আজ অত্যন্ত স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ তা হচ্ছে এই,—

বাংলা দেশে তথা এই কলকাতায় মানুষ এখনও নিরুদ্দিষ্ট হয়। কারণ, নিরুদ্দেশ হওয়ার হেতু এখনও দেশে বিস্তর।

'লালাবাবু'দের কথা বাদই দিচ্ছি, বাদ দিচ্ছি 'মরসুমী পলাতক' সেই কিশোরগুলোর কথাও যারা পরীক্ষার ফল বের হওয়ার তিন দিন আগে বা চার দিন পরে সহসা উধাও হয়ে যায়! (সম্ভবত আগামী ক'মাস ধরে এবারও তারা সেই ঐতিহ্য রক্ষা করবে!) এমনকি আমরা বাদ দিচ্ছি সেই সবে-তারুণ্য-অতিক্রান্ত মেয়ে দুটির কথা—যারা বোম্বাইয়ের পর্দার মায়ার মুর্শিদাবাদের গাঁ থেকে হাওড়া স্টেশন অবধি ছুটে এসেছিল। পতঙ্গের সেই রঙ্গ চিরকালই হয়ত কিছু কিছু থাকবে। হয়ত, কোন কোন ক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে বাবাই ছুটে গিয়ে থানার বড়বাবুর হাত জড়িয়ে তার কন্যা-বিষয়ক সংবাদটা অতঃপর চেপে যেতে অনুরোধ জানাবেন। কারণ শেফালির চিঠি পাওয়া গেছে। অহেতুক ঘাঁটাঘাঁটি করে ওর জীবনের শান্তি নষ্ট না করার জন্য সে মাকে অনুরোধ জানিয়েছে। ছেলেটিও শেফির মাকে 'মা' সম্বোধন করে প্রণাম জানিয়েছে! আজকের দিনে, আজকের সমাজে এ অবস্থায় কিছু কিছু নিরুদ্দেশ

অবশ্যই 'স্বাধীনতার' তপশীলভুক্ত, আমাদের মেনে নিতেই হবে। কিন্তু সেগুলো ?

সংবাদপত্রের কর্মব্যস্ত এই ঘরটায় বসেই দেখেছিলাম মায়ের মুখটা। দূর-পল্লী থেকে কাগজে ছাপা একটা ছবি দেখে কাঁদতে ছুটে এসেছেন তিনি! ছবিটি যদিও আপাত একটা রাস্তার ছবি তা হলেও মায়ের বিশ্বাস—তাতে তাঁর খোকাও রয়েছে।—দূরে ঐ যে ছেলেটি জুতো পালিশের বাক্স নিয়ে পাশ ফিরে বসে আছে, সে-ই আমার ছেলে—হক না চার বছরের ব্যবধান, ঐটিই আমার খোকা! বলুন, কোথায় পেয়েছেন আপনারা এই ছবি ? কবে পেয়েছেন ?

সবই বলা হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু তাহলে সঠিক আজ বলতে পারি না মা তাঁর খোকাকে পেয়েছিলেন কিনা! শুধু এটুকুই বলতে পারি যারা ওঁর খোকার মত হারিয়ে যায়—নানা বয়সের গেরস্থ ঘরের সেই ছেলেমেয়েরা ঘরে ফিরে মাত্র শতকরা আটান্নটি ক্ষেত্রে। বাদবাকী কেন ফেরে না সে শুধু ওঁরাই জানেন না। তাঁরা পুলিস! আমরা শুধু জানি পুলিসের ঘরে নিরুদ্দিষ্টের তালিকা যেমন আছে একটা, তেমনি আছে নিরুদ্দিষ্ট বাজ-পাখীদেরও একটা তালিকা। এবং দ্বিতীয়টাই নাকি দীর্ঘতর!

— তালাক ! — তালাক !

পর পর তিন দিন। তৃতীয় দিনে সাড়ে ন'ঘণ্টা বিতর্কের পরও ১৯৫৪ সনের ৮ই মে রাজ্যসভার যে পঁয়তাল্লিশ জন নবীন এবং প্রবীণ সদস্য 'স্পেশাল ম্যারেজ বিল' নামক 'কাগজটি'র চূড়ান্ত ভাগ্যনির্ণয়ক্ষণে হাত তুলতে সমর্থ হননি, কিংবা তারপরের বছর 'হিন্দু ম্যারেজ বিল' নামক আরও প্রলয়ঙ্করী বিলটিকে আইনে পরিণত হতে দেখে সেদিন যাঁরা সখেদে এবং সরবে লোকসভা-রাজ্যসভার ডেস্কগুলোতে করাঘাত হেনেছিলেন, অনুমান করি আজ তাঁরা সগর্বে দশদিক থেকে একটি সংখ্যার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে মৃদু মৃদু হাসছেন। কেননা, সংখ্যাটা ইতিমধ্যেই চার অঙ্ক বিশিষ্ট, এবং প্রকারান্তরে তা এই শান্ত সমাহিত সনাতন দেশের পাঁচ হাজার নয়শ' চুরান্নব্বুইটি ভাঙা-ঘরের প্রতীক।—সংখ্যাটা ১৯৬০ সনে ভারতে বিবাহ-বিচ্ছেদের সালতামামি !

আবার এমনও হতে পারে লোকসভা-রাজ্যসভার সেই আবেগ-মুখর মুখগুলো এই মূহূর্তে স্লেট পাথরের মত বিষাদাচ্ছন্ন এবং মৌন হয়ে যেতে পারে। যে হাতগুলো ঐতিহ্যকে রক্ষার নামে একদিন সর্বশক্তি নিয়োগ করে ডেস্কে সটান শায়িত ছিল আজ অক্ষমতা-জনিত লজ্জায় সেগুলো পকেটে আশ্রয় খুঁজতে পারে। কেননা, তাঁদের রায় কার্যকরী হলে শুধু ১৯৬০ সনেই এই ভারতের এগার হাজার নয়শ' অষ্টাশীটি নারী এবং পুরুষকে এ বছর ত বটেই—যাবজ্জীবনের জন্যে নরক দণ্ড ভোগ করতে হত। এই পাঁচ হাজার নয়শ' চুরান্নব্বইটি গৃহ-দাহের সংবাদ সেদিক থেকে আসলে এগার হাজার নয়শ' অষ্টাশীটি মানুষের মুক্তি-সংবাদও বটে !—নয় কি ?

কোন্‌টা সত্য, বিবাহ-বিচ্ছেদের বিচ্ছেদাংশটা, না স্বাধীনতার স্বেচ্ছাচারটুকু—সে বিতর্ক সিসিরো থেকে সি. সি. বিশ্বাস, রোম

থেকে রামরাজতলা পর্যন্ত অনেক হয়েছে, হয়ত ভবিষ্যতে আরও হবে, সুতরাং সেদিকে নতুন করে পা না বাড়িয়ে আপাতত আমরা শুধু এই সত্যটাই মেনে নিচ্ছি যে বিবাহের মত বিবাহ-বিচ্ছেদও আমাদের দেশে দিনে দিনে বাড়ছে।

—হ্যাঁ, প্রতিদিন।

জনৈক বিদেশী ভ্রমণকারী মার্কিন দেশ বেড়িয়ে এসে নাকি একবার বলেছিলেন যে তাঁর কাছে গোটা আমেরিকাটাই মনে হয়েছিল—'নোয়াস্ আর্ক', নোয়ার তরী। কেননা, পথে-ঘাট হাটে-বাজারে, স্কুলে-কলেজে, সিনেমায় পার্কে—মার্কিন দেশ সর্বত্র যুগল-রূপে।

আমরা এতটা অবশ্যই বলতে পারি না। কারণ, শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের পাতায় যদিও ঠিকানা অনেক তবুও লস এঞ্জেলস-এর মত পাকা তিন কলাম জুড়ে আমাদের টেলিফোন ডাইরেক্টরীতে প্রজাপতি-কার্যালয়ের ঠিকানা নেই। তদুপরি যে কোন ইংরেজ বা আমেরিকানের মত পরিষ্কার গলায় আমাদের অনেকেই 'আই ডু' বলার অধিকার নেই। কেননা—ঘরে ঘরে আমরা বেকার। তবুও হালে প্রকাশিত তথ্যাদি থেকে এটুকু অবশ্যই নিশ্চিত গলায় আমরা বলতে পারি যে অন্য কোন ক্ষেত্রে না হক মালা-বদলের ব্যাপারে বোধহয় আমরা ইস্রাইল, মিশর, সোবিয়েত ইউনিয়ন বা আমেরিকার মত প্রথম সারির দেশগুলোর পাশাপাশি বসে যেতে পারি।

সুতরাং বিবাহ ক্ষেত্রে ভারত যেখানে এমন অগ্রবর্তী সেখানে বিচ্ছেদের বেলায় তার পিছিয়ে থাকা বোধহয় কোন সঙ্গত হেতু নেই। বিশেষত, শাস্ত্র সমাজ, ঐতিহ্য ইত্যাদি যে কারণগুলোকে প্রাচীর স্বরূপ বলে আমরা মনে করতে অভ্যস্ত সেগুলো যেখানে ইতিমধ্যেই পতনোন্মুখ কিংবা ধূলিস্মাৎ! মনে রাখতে হবে, তা যদি না হত তবে উল্লিখিত আইনগুলো এদেশে পাশ করান কিছুতেই সম্ভব হত না। হলেও এক বছরে সেই আইনের ছায়াতলে

প্রায় বারো হাজার মানুষকে সারিবদ্ধ অবস্থায় দণ্ডায়মান দেখা যেত না। কি প্রক্রিয়ায় তা সম্ভব হয়েছে সে কথা পরে, তার আগে বিচ্ছেদের কথাটাই বলি।

অনিবার্য ভাবেই বিচ্ছেদের আগে বিয়ের কথা উঠেছে। কারণ দেখা গেছে যেখানে বিয়ের সুযোগ অফুরন্ত এবং বর-কন্যার বয়স একটা বিশেষ সীমার অন্তর্গত, বিচ্ছেদের সম্ভাবনা সেখানেই সীমাহীন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে আমেরিকা এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের কথা। আজ মার্কিন পুরুষদের অর্ধেকই তেইশ বছরে সংসারী সাজেন, মেয়েরা কুড়ির মধ্যে। বিশেষজ্ঞরা বলেন—আমেরিকা যে আজ বিবাহ-বিচ্ছেদের তালিকায় পৃথিবীর দ্বিতীয় দেশ (প্রথম মিশর) তার অন্যতম কারণ সেখানেই। অন্যদিকে এই ১৯৬১ সনেও আয়র্ল্যাণ্ডের কাছে বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্যে কোন আইনের প্রয়োজনীয়তা নেই, কারণ আইরিশ পুরুষ ঘর বাঁধেন তিরিশ বছর বয়সে, মেয়েরা গড়ে ছাব্বিশে।

সুতরাং সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বিচ্ছেদ-অঙ্কটির সঙ্গে গায়ে-হলুদের বয়সের কোন সম্পর্ক আছে কি না সে প্রশ্নটাও বোধহয় ভেবে দেখা দরকার। নয়ত কে জানে ক্রমে হয়ত এমন দিন আসবে যেদিন মার্কিন দেশের মত এদেশটাকেও শুধু 'নোয়ার তরী' বলেই মনে হবে না, পেছন থেকে ভাবিত সমাজকেও বিড় বিড় করে বলতে শোনা যাবে,—'সী ফর দি ফোর্থ টাইম হী ফর দি...'

উল্লেখ্য, অধিকাংশ মার্কিনী 'শুভবিবাহ' সংবাদে এই ছকটি আজ যখন তখন সত্য।

আশ্বাস কতখানি আছে জানি না, তবে আপাতত সান্ত্বনার কথা—সেদিন আমাদের দেশে এখনও ঐ আগত-প্রায় দিন নয়। অন্তত তালাকের তুলনামূলক তালিকাটি তাই বলে। শুনলে অবাক হয়ে যেতে হয় আজ আমরা সেখানে আছি আমেরিকা সেখানে ছিল

ঠিক একশ' বছর আগে, অর্থাৎ ১৮৬১ সনে। সে বছর ওদের বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়েছিল সাড়ে ছ' হাজার।—আর এবছর? হিসেব যাঁরা রাখেন তাঁদের ধারণা ডিসেম্বরটা শেষ হলে তার পরিমাণ দাঁড়াবে কম পক্ষে চার লক্ষ। উল্লেখযোগ্য, সংখ্যাটা ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং অস্ট্রেলিয়ার তিন গুণ, এবং নরওয়ে, কানাডা ও বেলজিয়ামের চার থেকে ছ' গুণ। স্বভাবতই,—ভারতের প্রায় সাতষট্টি গুণ।

তবে সেই সঙ্গে ভারতের ধর্মীয়, সামাজিক, ঐতিহাসিক, এবং অর্থনৈতিক পরিবেশে যে সপ্তসমুদ্রপ্রমাণ গরমিল তার কথাও ভাবতে হবে। তিরিশ নয়, চল্লিশ নয়,—পশ্চিমী সভ্যতার অন্যতম জননী প্রাচীন রোমে মেয়েদের বয়স বলা হত—'ইনি তিনবার বিবাহিতা অথবা চারবার' সেই হিসেব ধরে। আর আমাদের দেশে? মনু যদিও বিশেষ ক্ষেত্রে স্বামী বা স্ত্রী ত্যাগের নির্দেশ দিয়ে গেছেন, তাহলেও তিনি শাস্ত্রসিদ্ধ বিয়েকে কদাপি ভঙ্গুর বলে স্বীকার করেননি। আজকেও কোটি কোটি ভারতবাসীর কাছে বিবাহবন্ধন মৃত্যুর পরেও অচ্ছেদ্য। সুতরাং এমন দেশে এক বছরে আদালতের মাধ্যমে ছ'হাজার বন্ধন-ছেদনের অনুরোধ উল্লেখযোগ্য ঘটনা বৈকি।

দ্বিতীয়ত, আমেরিকায় প্রতি তিনজন স্ত্রীর মধ্যে একজন নিজে উপার্জনশীল। অথচ ভারতে ক্ষেত-খামার, খনি-কারখানা সব ধরলেও এই সংখ্যা হাজারে তিনজন দাঁড়াবে কি না সন্দেহ!

তৃতীয়ত, ওসব পশ্চিমী দেশের অধিকাংশ মানুষই আজ শহর-বাসী। আমরা এখনও প্রধানত গ্রামবাসী। সেসব গ্রামে সূর্যালোক ছাড়া আজও সিনেমা-থিয়েটার, লোন-হার্ট ক্লাব,—ইত্যাদির অন্যতর কোন আলো নেই। লসএঞ্জেলস-এ এত মনস্তত্ত্ববিদ আছেন যে তিন পাতায় তাঁদের ঠিকানা ধরান যায় না। —আর আমাদের গ্রামে? অঙ্ক, ইলেক্‌ট্রিসিটি এবং ডায়গ্রাম-যোগে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আচরণবিধি শেখাবার লোক ত অনেক পরের কথা, মেয়েদের অ-আ-ক-খ শেখান অনেক গাঁয়ে তেমন মাস্টারও

নেই। সুতরাং শিক্ষায়, দীক্ষায় এবং টাকা পয়সায়— এই যে জড়সড় স্থির ভারত সেখানে হঠাৎ ক্যালিফোর্নিয়ার ঝড়ো হাওয়া দেখে যাঁরা চমকিত হয়ে উঠেছেন তাঁদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। তাঁদের একমাত্র ত্রুটি—তাঁরা ঝড়ের ফলাফলটাই শুধু আজ দেখলেন। দশকের পর দশক ধরে যে খণ্ড খণ্ড মেঘের প্রস্তুতি সেই পূর্বাভাসটুকু সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছেন!

প্রবল বৈপরীত্য সত্ত্বেও নজর করলে দেখা যাবে, যে, কারণে ইংলণ্ডে বছরে প্রায় সত্তর-আশি লক্ষ বিবাহ-বিচ্ছেদ আমাদের পেছনেও কমবেশী সেই কারণগুলোই বর্তমান।

প্রথমত রাজ্য ধরে হিসেবটা পরখ করা যাক। মার্কসীটের নিয়মে সংখ্যাগুলো সাজালে ১৯৬০ সনের ৫,৯৯৪ জন দম্পতির অধিকারী যথাক্রমে ঃ

মহারাষ্ট্র	১০২৩	মহীশূর	৩৫১
কেরল	৭৪৩	গুজরাট	২৩৮
পশ্চিমবঙ্গ	৬৯৮	মধ্যপ্রদেশ	১৫৮
অন্ধ্র	৬০১	রাজস্থান	১৩৬
উত্তর প্রদেশ	৫৫০	হিমাচল প্রদেশ	১২৩
মাদ্রাজ	৪৩৪	বিহার	৯৪
পাঞ্জাব	৩৮৯	উড়িষ্যা	৬৯
দিল্লি	৩৫৩	ত্রিপুরা	১৪

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি রাজ্য বিবাহ-বিচ্ছেদ ব্যাপারে উত্তর ও পশ্চিমের বহু রাজ্যের চেয়ে অগ্রবর্তী। কারণস্বরূপ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—মালাবারে কোন কোন শ্রেণীতে বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রচলন অনেক দিনের। তা ছাড়া বরোদা, তথা বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং সৌরাষ্ট্রেও ১৯৫৫ সনের আগে থেকে বিবাহ-বিচ্ছেদ বিষয়ে সরকারী আইন ছিল। সুতরাং, ১৯৩১ বা '৩৭ সন থেকে যারা ঘটনাটার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত তারা

অপরিচিতদের যে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবে তাতে বিশেষত্ব কিছু নেই। বরং তার চেয়ে ঢের বেশী গুরুত্বপূর্ণ উত্তর প্রদেশ বা দিল্লির পরিস্থিতি।

ছোট্ট রাজ্য দিল্লি বা এককালের পেছনে-পড়া রাজ্য উত্তরপ্রদেশ যেভাবে বিরাট বিহারকে পেছনে ফেলে চলে গেল তার থেকেই বোঝা যায়—কল-কারখানা তথা আধুনিক আর্থিক এবং সামাজিক পটভূমির প্রভাব দাম্পত্য-জীবনের গভীরেও কতখানি!

দৃষ্টান্তটা আরও বিশদ করা যেতে পারে পশ্চিমবঙ্গের উদাহরণ দিয়ে। হিন্দু বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন চালু হওয়ার পরেই যে হিসেবটা পাওয়া গিয়েছিল তাতে দেখা গিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ আদালতে দরখাস্ত পেশ করা হয়েছে ৮৭৫ খানা! তার জেলা-ওয়ারী হিসেব

চব্বিশ পরগনা — ২৯৭
মেদিনীপুর — ১৬০
বর্ধমান — ৫৭
কলকাতা — ৫৪
হাওড়া — ৪১

এবং এবম্বিধ।

এর থেকে শিল্প-প্রগতি, আধুনিকতা ইত্যাদির প্রভাব ছাড়াও বোধ হয় আর একটি খবর পাওয়া যাচ্ছে। সেটা—শিক্ষা-নিরপেক্ষতা। একথা মনে করার কোন হেতু নেই বর্ধমানের চেয়ে কলকাতায় শিক্ষিত দম্পতির সংখ্যা কম। তবুও যে তারতম্য, বিবাহ-বিশেষজ্ঞরা বলেন—সেটা লক্ষ্য করার মত। কেননা, তাঁরা বলেন—পশ্চিমী দেশগুলোতেও দেখা যায়—অধিকতর শিক্ষিত দম্পতির চেয়ে স্বল্প-শিক্ষিতরা বিচ্ছেদ বিষয়ে অনেক বেশী বেপরোয়া!

এমন করে ভালবেসে যে মেয়েটিকে ঘরে আনলাম কিংবা এত দেখেশুনে, তার সঙ্গে কেন বিচ্ছেদ?—যে মানুষকে প্রাণ মন সঁপে

দিয়েছিলাম—আজ কেন তাকে ঠেলে দিতে পারলে বাঁচি? প্রশ্নটা মূলত—মানবিক। এবং সেকারণেই যথেষ্ট জটিল। আইন কঠিন গন্থে তার যা যা কারণ নির্দেশ করে তার মধ্যে আছে—দুর্ব্যবহার, পরিত্যাগ, উন্মাদনা, স্বাভাবিকতাহীনতা, অসুস্থতা, ব্যভিচার ইত্যাদি দশ-ব্যবহার।

মার্কিনী হিসাব অনুযায়ী যথাক্রমে প্রতি শ'তে তার পরিমাণ, —মদ্যসক্তি—৩০%, পরকীয়া—২৫%, দায়িত্বহীনতা—১২%, মেজাজের গরমিল—১২%,শাশুড়ী প্রভৃতি—৭%, দৈহিক অসামর্থ্য —৫%, মানসিক অসুস্থতা--৩%, ধর্মীয় মতবিরোধ—৫%, বিবিধ —২%, এবং অর্থসমস্যা—'%।

আমাদের দেশের পরিসংখ্যানটি এখনও এভাবে বিশ্লেষণ করা হয়নি। হলে, অনেকেরই ধারণা কিছু কিছু কারণের স্থান পরিবর্তন হয়ত হবে, কিন্তু তেমন কোন অচিন্তনীয় পরিবর্তনের দেখা পাওয়া যাবে না। অন্তত, গরীবের দেশ বলেই অর্থ-সমস্যা শীর্ষে স্থান পাবে না। কেননা, অনিবার্য এবং প্রত্যক্ষ কারণগুলো (যথা, ধর্মান্তরিত, নিরুদ্দিষ্ট বা উন্মাদ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি) বাদ দিলে বিবাহ-বিচ্ছেদ নিশ্চিতভাবে মানসিক ব্যাপার। এবং একথা সর্বজনবিদিত যেখানে মন আছে দরিদ্র সেখানে সুখী দম্পতি, অথচ রাজকুমারীর চোখে ঘুম নেই।

তার চালচলনে হাবভাবে সতত নানাবিধ বক্তব্য। যথা :— 'তুমি আমাকে এভাবে কথা বলবে না, আমি তোমার—,' '—জান, ইচ্ছে করলে সেদিন আমি এর চেয়ে ঢের ঢের ভাল পাত্রের...,' কিংবা 'জানি, তোমার খাতির ত শুধু—' ইত্যাদি।

অসুখী রাজকুমারেরও অনেক কথা। '—আই অ্যাম্ নট ইনটারেস্টড ইন মিউজিক কনফারেন্স!' '...জানি তোমার মা কি প্রকৃতির—,' '—আমি বাড়ী ফিরলেই যে এমন ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছ আজকাল'—ইত্যাদি ইত্যাদি।

উল্লেখযোগ্য, এখানেও এক হাতে তালি বাজে না। আমাদের দেশে মাতাল স্বামীর ঘর করতে হয় বলে যেমন স্ত্রীদের জন্য অনেক দীর্ঘশ্বাস, পশ্চিমে দেখা গেছে—কাঁদতে ইচ্ছে হয় মদ্যাসক্ত স্ত্রীদের স্বামীকুলের জন্যে। সুতরাং, কারণ দু'তরফেই প্রভূত। এমনকি শিক্ষার স্বাচ্ছন্দ্য এবং আর্থিক নির্ভরতা একেবারে প্রায় অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও।

পুরানো হিসেবটা থেকেই আবার শোনাচ্ছি। শুনে চমকে উঠবেন না। এই আইনের অব্যবহিত পরে পশ্চিম বাংলার আদালতে যে ৮৭৫ খানা দরখাস্ত পড়েছিল তার মধ্যে ৪৩২ খানা পাঠিয়েছিলেন স্ত্রীরা! বাকীগুলো স্বামীরা। সেদিন কোচবিহারের আদালতে পুরুষেরা বিচ্ছেদ প্রার্থনা করেছিলেন যেখানে মাত্র তিনটি ক্ষেত্রে, মেয়েরা সেখানে ছিলেন সাতশ জন। জলপাইগুড়িতেও তাই। মেয়ে ও পুরুষ প্রার্থীদের অনুপাত ছিল সেখানে—চার ও তেইশ!

শুধু বাংলা দেশের পার্বত্য এলাকার মেয়েদের ক্ষেত্রেই নয়, তামাম দুনিয়ায় প্রধানত তাঁরাই সংবাদ। কেন; সেকথা আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। আপাতত এটুকুই উল্লেখ্য, এই আইনটা সম্ভবত তাঁদের কথা মনে রেখেই সর্বত্র লিখিত।—আরও উল্লেখযোগ্য ইতিহাসে অষ্টম হেনরী একজন, কিন্তু হলিউডে মেরেলিন মনরো অনেক।

মধ্যবিত্তের গৃহযুদ্ধ

অবশেষে পুরুষের ভাগ্যে আরও একটি নতুন বিশেষণ যুক্ত হয়েছে। পৌরুষ, বীরত্ব, হৃদয়হীনতা, মেয়েলিপনা ইত্যাদির সঙ্গে আরও একটি নতুন পদক তাদের গলায় ঝুলেছে। মেয়েরা তাদের নতুন নাম দিয়েছেন—নেকড়ে ; সেই নেকড়ে, যা আরণ্যক এবং বন্যদের মধ্যেও আচারে বর্বর।

বিশেষণটা মনোযোগ দিয়ে ভাবার মত। কারণ, নতুন পদবীটা যেখান থেকে ঘোষিত হয়েছে সেটা আমেরিকার উত্তরাংশ নয়, —ভারতের উত্তর প্রদেশ। লখনউ-এর খবর, কয়েক সপ্তাহে সেখানকার প্রায় বারো শ' মহিলা রাজদ্বারে বিচারপ্রার্থিনী হয়েছেন। তাঁরা অচিরে তাঁদের নিজ নিজ স্বামী অথবা পিতার হাত থেকে মুক্তি চান। কারণ, ওঁরা নেকড়ে।

শব্দটা শ্রুতিকটু কিনা, কিংবা সমগ্রভাবে পুরুষ-কুলের প্রতি (পরীক্ষামূলকভাবেও) তা প্রয়োগ করা যায় কিনা সে তর্কে নামবার আগে মনে পড়ছে বহুবার স্বামীত্যাগী একটি সহৃদয়া পশ্চিমী বিশ্ব-সুন্দরীর কথা। পুরুষদের তিনিও 'খাদক' আখ্যা দিয়েছিলেন বটে কিন্তু লখনউয়ের মেয়েদের মত এতটা নির্দয় হতে পারেননি। তিনি বলেছিলেন, 'এ ম্যান ইজ লাইক এ বয় ইন এ রেস্টুরেণ্ট। হি ক্যান ওনলি ইট এ লিটল,—বাট ওয়াণ্টস দি হোল মেন্থ।' অর্থাৎ—ওরা খেতে চায় সবটাই বটে, কিন্তু আসলে খায় নামমাত্র। তাই বলি লখনউয়ের মেয়েরা সরাসরি রাজদরবারে আরজি নিয়ে ছুটবার আগে আর একটু ভেবে দেখলে পারতেন। একথা আরও বলছি এজন্যে যে, শোনা গেল বয়স তাদের সবারই তের থেকে উনিশ। উল্লেখযোগ্য, প্রথমোক্তটি যেমন ললিতার লালিত্যের শেষ বছর, শেষোক্তটি তেমনি 'টিনস' নামক বিপজ্জনক বয়ঃপরিধির শেষ

সীমান্ত। বালক-বালিকাদের চোখে (আইনত শেষোক্ত ক্ষেত্রে 'সা' যুক্ত করলেও) সেই ম্যাকমোহন লাইনের এপারে অনেক স্থান। সর্বত্র অফুরন্ত স্বাধীনতা। স্বাধীনতা এ বয়সে নেশা। তবে দুঃখের বিষয় লখনউয়ের মেয়েরা তাঁদের চেয়ে অনেক অগ্রগামী ইংরেজ মেয়েদের কাছ থেকে পরামর্শ নিলে শুনতেন ক'বছর আগে ইংল্যাণ্ডে বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়ে গেছে। সেই উপলক্ষ্যে জানা গেছে স্বাধীনতা বস্তুটা চাইতে যেমন উত্তেজনাময় পাওয়ার-পর সকলের পক্ষে ঠিক ততটা উপভোগ্য নয়। কঙ্গোর মত অনেকেই নাকি শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করে থাকেন যে সে বস্তুর অন্য অর্থও হয়।

—মন্দিরে মন্দিরে মানত, লখনউয়ে যেন তার পুনরাবৃত্তি না হয়!

'নেকড়ে' খেতাব পাওয়ার পরেও মেয়েদের নাম মানত করছি। তার কারণ, সত্যি বলতে কি—পুরুষেরা সত্যিই নেকড়ে কিনা সে বিষয়ে আমি ঘোরতর সন্দেহ পোষণ করি। এবং আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি—অনেক মেয়েও এবিষয়ে আমার সঙ্গে একমত। যাঁরা প্রবল প্রতিবাদী তাঁদেরও এবিষয়ে দ্বিমত নেই যে, তর্কটা সত্যিই এখনও অমীমাংসিত।

শুরু হয়েছিল বোধহয় সেই গাছতলায়, যার ডালে ছিল একটি নিষিদ্ধ ফল! তারপর থেকে টলস্টয়, বায়রণ, মেরী উলস্টোনক্রাফট, মার্গারেট মেড, মেরী স্টোপস, মনু-পরাশর, কিনস-কৃপালনী পর্যন্ত সেই তর্ক আজও চলেছে। ক'মাস আগে নিজের ঘরের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করে আচার্য যা বলেছিলেন তাতে বোধহয় এই সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়েছিল সেদিন যে, কে নেকড়ে বা কারা 'রাতকা বাঘিনী' সে বিষয়ে এখনও কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি!—নয় কি?

তবুও যে আমরা আবেদনশীলা লখনউ-ললনাদের পক্ষ সমর্থনের জন্যে একটা আন্তরিক তাগিদ অনুভব করছি তা গোপন করে লাভ

নেই। নিশ্চিন্ত থাকতে পারে এ দুর্বলতার কারণ—বিশেষ কারও গৃহগত নয়।

প্রথম কারণ, আমরা পুরুষেরা এ সত্যটা আজ জানি এবং মানি যে কোন পক্ষের কোন স্ট্রাটেজির ভুলে নয়, সমাজ-বিবর্তনের স্বাভাবিক কার্যকারণের ফলস্বরূপই মাতৃপ্রধান সমাজটা একদিন পিতাদের হাতে এসে পড়েছিল, এবং আইন অন্যবিধ বললেও অস্বীকার করে লাভ নেই—আমরা আজও সেই মনু-পরাশর রক্ষিত হোলি বৈদিক এম্পায়ারের সম্রাট। অবশ্য,—বাহাদুর শাহের মত শেষদিককার! সুতরাং, দায়িত্ব স্খালনের চেষ্টা কাপুরুষোচিত। সেটা যুদ্ধে নেমে পিঠে গুলী খাওয়ার মত। বোধহয়, কোন পুরুষই তাতে রাজী হবেন না।

দ্বিতীয়ত, আমরা মেয়েদের পক্ষেই রায়দানের পক্ষপাতী কারণ আমরাই সম্ভবত পুরুষ, বা পৌরুষ শব্দটার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একমাত্র মানুষ! পশ্চিমের জনৈকা স্বাধীনা সুইডেনের রাণী ক্রিশ্চিনা একবার বলেছিলেন—'আই লাভ মেন, নট বিকজ দে আর মেন, বাট বিকজ দে আর নট উইমেন।' অর্থাৎ, পুরুষদের আমি ভালবাসি এজন্যে নয় যে তারা পুরুষ,—ভালবাসি, কারণ তারা মেয়ে নয়। লখনউয়ের মেয়েদের প্রসঙ্গে আমাদেরও সেই একই বক্তব্য—হাজার হক, ওঁরা পুরুষ নন। (লক্ষ্য করছেন বোধহয়, আমরা তাদের 'অবলা' বলছি না)।

সুতরাং, নারী-পুরুষের দ্বন্দ্ব আপাতত এখানেই বন্ধ। অতঃপর ভেদ-জ্ঞানহীন নাবালকের মত মৌন সমাজের পক্ষ থেকে আমাদেরও একমাত্র জিজ্ঞাসা—কেন এমন হল? কেন এমন হচ্ছে? কেন—ক সপ্তাহে বারো শ' মেয়ে মুক্তি চাইছে। কেন? কি কারণে?

আমি এক ভদ্রমহিলাকে জানি। তিনি—সম্পন্ন, সম্ভ্রান্ত, সুশ্রী এবং বুদ্ধিমতীও। কুড়ি বছর আগে তিনি একটি ঘরে ঢুকেছিলেন। ঢুকেই বেরুবার জন্যে ছটফট শুরু করেছিলেন।

বছরের পর বছর প্রতিদিন তাঁর সেই মুক্তির স্বপ্ন বেঁচে ছিল। সম্ভবত আজও আছে। কিন্তু আশ্চর্য আজও তিনি বের হননি। আজও তিনি ঘর ছাড়েননি।

ছাড়েননি এজন্যে নয় যে, দেশে তখন সেই বাবদে কোন আইন ছিল না, কিংবা আঁচলে স্বাধীনতার খরচ চালাবার মত পয়সা ছিল না, কিংবা—ঘরে একাধিক সন্তান ছিল। শুনে শুনে যতদূর বুঝেছি,—দ্বিধার একমাত্র কারণ ছিল চোখের সীমানায় 'প্রিসিডেন্স' বা ঐতিহ্য নামক যে বস্তুটি—তার নিদারুণ অভাব। ওঁর নিজের কথায় বললে—ভয় ছিল একমাত্র সামাজিক প্রতিক্রিয়ার। —অনেক ভেবে দেখেছি একজন অপছন্দের স্বামী নিয়ে ঘর করা যত কঠিন তার চেয়ে ঢের বেশী কঠিন—ভূমণ্ডলময় ছড়ান আত্মীয়দের একটি প্রশ্নের মোকাবেলা করা, '—যা শুনছি তা কি সত্যি?'

দ্বিতীয় কাহিনীটা চোখে দেখা নয়,—শোনা।

তিরিশ বছর ধরে একটানা সুখের দাম্পত্যজীবন চালিয়ে যাচ্ছেন এক মার্কিন দম্পতি। খবরের মত খবর বৈকি! সাংবাদিকেরা তখনই ছুটলেন সে ভদ্রলোকের বাড়ীর দিকে। '—কি ব্যাপার স্যার,—এও কি সম্ভব?' বৃদ্ধ পাইপে আগুন দিয়ে বললেন—'কেন নয়?'

'—বাট, হাউ?'—'কি করে?' অধৈর্য কাগজওয়ালারা অশান্ত পৃথিবীকে সে মন্ত্র শেখাতে চায়।

বুড়ো বললেন—'তবে শোন। সে তিরিশ বছর আগের কথা। চার্চ থেকে বের হয়েই স্ত্রীকে নিয়ে চড়লাম ত ঘোড়াতে।—দু'জন একসঙ্গে ত আর কখনও চড়িনি, দু'পা চলতে না চলতে ঘোড়া হোঁচট খেল। মেজাজটা বিগড়ে গেল। তবুও ছেড়ে দিলাম, যাকগে প্রথমবার যখন।—কিছুদূর আসতে না আসতে আবার। তারপর বাড়ীর সামনে এসে আবার।—থার্ড টাইম। এবার আর আমার পক্ষে ধৈর্য রক্ষা সম্ভব হল না। স্ত্রীকে নামিয়ে তক্ষুনি পিস্তলটা

বের করে দিলাম বেটাকে সাবাড় করে। তাই দেখে নতুন বৌয়ের সেকি যাচ্ছেতাই গালাগালি চিৎকার।—বলে, তুমি একটা আস্ত নরপশু, এমন জানলে কক্ষনো আমি তোমার মত মানুষকে বিয়ে করতাম না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

পনের মিনিট ধরে আমি নিঃশব্দে সব শুনলাম। তারপর ওর বলা শেষ হলে শুধু একটা কথা বললাম।—কি কথা বলেছিলাম জান? বলেছিলাম—মাইণ্ড ইট, দিস ইজ দি ফার্স্ট টাইম!—তার-পর থেকে আমি আর আমার স্ত্রীর মধ্যে কোনদিন ঝগড়া হয়নি।'

বলা নিষ্প্রয়োজন, সেদিন আজ সম্পূর্ণত না হলেও অনেকাংশে বিগত। চেস্টারটোনের মত যে স্বামী আজও বলতে চান যে, নারীরা যে তিনটি বস্তু মনে মনে চায় না সেগুলো হচ্ছে সাম্য মৈত্রী এবং স্বাধীনতা—, তিনি সত্যিই করুণার পাত্র। কারণ, তিনি জানেন না তিনি কোথায় আছেন।

আইনের কথা বাদই দিচ্ছি। তিনি জানেন না কুড়ি বছর আগে যে ভদ্রমহিলা সমাজের ভয়ে সদরের দরজা খুলতে সাহস পেতেন না—আজ যুদ্ধ, দেশ-বিভাগ, দাঙ্গা, এবং সাহিত্য-সিনেমার পরে তাঁকে নিয়ে কানাকানি করার মত সময়টুকুও আর সমাজের হাতে নেই। কারখানার ঘর্ঘর আর জেট প্লেনের আওয়াজে বধির কানে শোনবার শক্তিটুকুও বোধহয় আজ আর নেই। এবং নেই বলেই বোধহয় খবরের কাগজে আজ পাঠ্যবস্তু হিসেবেই ওঁদের গৃহত্যাগের খবরগুলো ছাপা হয়!

তবুও লখনউয়ের খবরটা আজ মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলব। কারণ মুক্তির দরজা খোলা আছে শুনেই শত শত মেয়ে গৃহত্যাগী হচ্ছে—এ সংবাদ যাঁরা বিশ্বাস করবেন আমরা তাঁদের দলে নেই। কেননা, আমাদের বিশ্বাস, দেশে যথেষ্ট পাগলা গারদ আছে শুনলেই দেশের লোক ঝাঁক বেঁধে পাগল হয় না। সে ভূমিকম্পের পেছনে আমাদের বিশ্বাস,—অনেক কারণ।

প্রথম কারণটি বোধহয় খবরটির যে অংশে আপাত চাঞ্চল্যের উপাদান সেখানেই। শোনা গেল, এই বারো শ' মেয়ের অধিকাংশই নাকি জাতে 'মধ্যবিত্ত'।—অর্থাৎ তাঁরা সমাজের সেই অংশ থেকে আগত, যেখানে বিত্তের একটা প্রশ্ন আছে। তদুপরি আছে—কুলজী, ঠিকুজী, হাঁচি-কাশি তথা যাকে বলে 'মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তি' ওরফে বিচিত্র সংস্কারবলীর প্রশ্ন।—সুতরাং ?

সুতরাং তবুও যে ঘটনাগুলো আজ সম্ভব হচ্ছে তার কারণ বোধহয় এই যে, মনু-বল্লালের ঐতিহ্য যেমন তাদের ঘাড়েই সবচেয়ে বেশী বর্তেছে, তেমনি—মনে রাখতে হবে, শরৎচন্দ্র, ডি. এইচ. লরেন্স বা কাফকার কেতাবগুলোও সবচেয়ে বেশী পরিমাণে তাদের হাতেই পৌঁছেচে। এবং বলা নিষ্প্রয়োজন, পৌঁছেচে প্রধানত অর্থনৈতিক প্রয়োজনবশতই। নিঃসন্দেহে কন্যার অভ্যন্তরে আলো বিকিরণের তাগিদে নয়, বাবা মেয়েকে কলেজে পাঠিয়েছিলেন ভবিষ্যতে 'মাস্টারনী' করার প্রত্যাশায়।

সেখানেই সম্ভবত 'স্বাধীনতা' তথা কিঞ্চিৎ আভ্যন্তরীণ গোল-যোগের প্রথম সূত্রপাত। জনৈক ইংরেজ সমাজতাত্ত্বিকের ভাষায় বলতে গেলে—টাইপরাইটারই নারীর মুক্তিযুদ্ধে প্রথম যুদ্ধ-জাহাজ। কিভাবে মধ্যবিত্তের ঘরে অর্থকে কেন্দ্র করে সেই অনর্থ সৃষ্টি হতে পারে তার দু'-একটি উদাহরণ শুনুন এবার।

মিস্টার এবং মিসেস বসু দুজনেই মোটামুটি শিক্ষিত এবং দু'জনেই রক্তে মধ্যবিত্ত। ওঁরা পরস্পরকে জেনে অর্থাৎ ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন। ওঁরা দুজনেই চাকরি করেন। সুতরাং, যেহেতু মাইনেও দু'জনের প্রায় সমান সেই হেতু মিসেস বসু মিস্টার বসুকে দিয়ে কখনও কখনও বাচ্চার ফিডিং বোতলটা পরিষ্কার করাতে পারেন। স্বাভাবিক এবং সুখী দাম্পত্য জীবনে এটা কোন সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু যেহেতু দীর্ঘ 'কোর্টশিপ' বা পূর্বরাগ-অন্তে বাঁধা ঘর, সুতরাং একপক্ষের প্রস্তাবে কিঞ্চিৎ আদেশের সুর

ধ্বনিত হতে পারে এবং অন্যপক্ষের কানে তা কিঞ্চিৎ বিরক্তিকরও ঠেকতে পারে। এবং তার পরিণতি হিসেবে শেষ পর্যন্ত কোর্টে দরখাস্তও পড়তে পারে। আমি যে মিসেস বসুকে মনে রেখে কথাগুলো লিখছি তিনি অবশ্য এতদূর এগোতেন না যদি না মাস-কাবারী মাইনেটুকু তাঁর নিজের নামেও আসত। এবং যদি না তিনিও প্রতিদিন আপিস নামক একটি মাঠে বিচরণ করতেন।

বাড়ীতে যা পান না অফিসে মিসেস বসু তো চোখের ইশারা-মাত্র পান। তিন টেবিল ডিঙ্গিয়ে এসে ছেলেটা রুমাল এগিয়ে দেয়, চোখের জল মুছিয়ে দিতে চায়। খবর নিলে দেখা যাবে মধ্যবিত্তের 'গৃহদাহের' পেছনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রয়েছে এই 'ইন্টারনেল ট্রায়েঙ্গেল' নেপথ্যে তৃতীয় মানুষ।

অবশ্য এমনও হতে পারে। স্বামী অসুস্থ কিংবা বেকার। প্রথমোক্ত ব্যাপারটি চিকিৎসার অতীত হলে বিচ্ছেদ স্বাভাবিক এবং শাস্ত্রসম্মতও। কিন্তু দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে অনেক কিছু হতে পারে।

যেমন, কিছুদিন আগে খবরের কাগজের পাতায় পড়েছিলেন,—স্বামী বেকার, সুতরাং তিনি সম্পন্ন বন্ধুদের রাত ন'টায় হঠাৎ নিজ বাড়ী এনে বসিয়ে দিয়ে সরে পড়তেন।—এ ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি উপযুক্ত পরিমাণ পতিভক্তি না দেখান তবে শাশুড়ি তার বিচার করতে পারেন এবং মেয়েটি শেষপর্যন্ত ঘোমটা খুলে আলুথালু বেশে থানা অবধি দৌড়াতে পারে।

তবে আমি একটি স্ত্রীর কাহিনী শুনেছি যিনি বেকার স্বামীকে ত্যাগ করেছিলেন সম্পূর্ণ অন্য কারণে। তিনি—'বেকারের বোঝা বয়ে বয়ে ক্লান্ত হয়ে' পড়েছিলেন।

উপসংহারে আর একটা ছোট্ট কাহিনী। মধ্যবিত্তের ঘরে অর্থ সমস্ত অনর্থের মূল বটে, কিন্তু মনে রাখবেন—কখনও কারণ অন্য রকমও হয়।

এমন ঘটনাও আছে যেখানে ধন নয়, মান নয়—ভাঙ্গাঘরের

পেছনে থাকে শুধু সন্দেহ।'—ইংরেজীতে যাকে বলে 'লিপস্টীক, ইন দি কলার?'—বাংলায় যে ঝড়ের নাম 'সন্দেবায়ু'।

মেয়েটির অভিযোগ—'আমি ওঁকে আর বিশ্বাস করি না কারণ ও এতদূর নেমেছে যে এখন মদ পর্যন্ত খায়...'

ছেলেটি বলে—'মদ খাই কেন জানিস, বাড়ীতে আমার শান্তি নেই—'তরলের বলে কঠিন জীবনটাকে ভুলে থাকতে চাই।'

"Turn we now to the chophouses in Lall Bazzar. These are generally kept by sailors······These piaces are frequented by soldiers, sailors, runners and loafers. Some of them have a small room at the back in which a great deal of vice and debanchery is perpetrated by means of the miserable girls······"

The Social Evil in Calcutta, 1886 (3rd Ed.) By—Roebrt Kerr

*   *   *

···Voices that start off low and confidential, only to get louder and louder, more and more indignant at one's absurd fussiness: 'Chinese girls? Girl from Burma? Singing girl?—Come and see! only see! If no like no pay!—Take my rickshaw Mr.! only see!······'

The under-world of Calcutta has something for every taste and distaste.

A Barbarian in India, (Page—60) By Ralph Oppenhejm, 1957

*   *   *

'Do you fancy us?

'No,' I said frankly.

We drove on. 'Uske umer bahuth uper the', the driver said······we circled into another street of dark houses. 'Nepalese girls here and said the pimp······ Walking on quick furtive mouse-toe, came two very pretty Napalese girls··· . 'Do you want them in the

taxi or do you want to come up ?' asked the man.
'In the taxi', Ved said···

Gone Away, (Page—158) By Dom Moraes, 1960

* * *

চৌরঙ্গীর সন্ধ্যায় সেদিন কুয়াশা ছিল। কিন্তু নিওনের আলোয় চোখের কালো কাজলে লেখা ভাষার অর্থ অস্পষ্ট নয়। তার ইঙ্গিত গোটা নগরের জন্যে। সেই রাত্রে ঐ রাস্তা দিয়ে যাঁরা হাঁটছিলেন, ট্যাক্সিতে যাঁরা ছুটছিলেন, গাড়িতে যাঁরা নগর দেখতে দেখতে বাড়ি ফিরছিলেন তাঁদের প্রত্যেকের জন্যে। কেননা, মেয়েটি দাঁড়িয়ে ছিল বিদেশী টুরিস্ট অফিসের বিজ্ঞাপনের ঢঙে।

তৃতীয়বার তাকাতে পারিনি। ঘৃণায় নয়, ভয়ে নয়, কোন নৈতিক কারণবশতও নয়,—লজ্জায়। তবে কি সত্যিই কলকাতাকে শিকাগো করে ফেললাম আমরা? নয়ত, এই শীতের রাতে এই আলো-ঝলমল জনপথে কেন এই 'স্ট্রীট-ওয়াকার,'—পশ্চিমী কায়দায় নাগরিকা?

ট্যাক্সিটা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছিল সেখানে নিওন ছিল না। পানের দোকানটার পাশে গলি-মুখে একটা গ্যাসের পিদিম টিম টিম করে জ্বলছিল। গাড়িটা সেখানেই এসে দাঁড়াল। দরজাটা খুলল। মেয়েটি নামল। কোটে-মোড়া হাতটা সশব্দে আবার দরজাটা বন্ধ করল। গাড়িটা দীর্ঘশ্বাসের মত খানিকটা ধোঁয়া ছাড়ল। তারপর মুহূর্তে আবার বড়রাস্তার দিকে চাকা বাড়াল। মেয়েটি হাঁটতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল। ব্যাগটাকে হাতে গলিয়ে দিয়ে সে খোঁপায় হাত দিল। সেখানে মস্ত মাদ্রাজী খোঁপাটিকে ঘিরে একটি বেল-ফুলের মালা। মেয়েটি সাবধানে সেটি খুলে হাতে নিল, একবার ফুলগুলোর দিকে তাকাল, তারপর আলতো হাতে মালাটা ছুড়ে দিল সামনের নর্দমাটায়। পানের দোকানের টাইমপিসে রাত তখন দশটা বেজে কয়েক মিনিট। বোঝা গেল এই রাতে এ চিহ্ন সে ঘর

পর্যন্ত বয়ে নিতে চায় না। কেননা ট্যাক্সির জানালায় যে মুখটি দেখা গিয়েছিল সেটি জানিয়ে গেছে সম্পর্কটা সত্য নয়। না বয়সে, না জাতে,—না অর্থে,—না স্বভাবে। অথচ আশ্চর্য,—এ পাড়া, এ রাস্তা কোনদিন রক্তালোকে আলোকিত কোন এলাকায় ছিল না। কখনও না। তবে কি কলকাতার যে কোন রাস্তাই আজ নরকে অন্তর্লীন ?

কড়া বিদ্যুতের আলো ছিল ওয়াটগঞ্জের সেই ঘরটায়। খদ্দেরও ছিল কম কম করেও জনাকয়। কিন্তু ভারী পর্দাখাটান কুঠুরী-গুলোতে তার কোনটাই ছিল না। আলোটা মায়াবী ছিল এবং ভিড় একদম না। সুতরাং, পিছনে পর্দাটা ঠিক করে মেয়েটি এসে কাছে দাঁড়াল। ছেলেরাও সাধারণত এত কাছে আসে না। দরকার হয় না। কিন্তু ও একটু ভিন্ন ধরণের দোকানী। ঘাড়টা বাঁকিয়ে চোখগুলো নাড়িয়ে এবং শরীরটা কাঁপিয়ে জানতে চাইল—'কি দেব ?'

'—চা।' তিনজনে একসঙ্গে দাঁতে দাঁত চেপে উত্তর দিলাম আমরা।

'—শুধু—চা ?' মেয়েটি একটু অসহায় হওয়ার চেষ্টা করল। '—এই সন্ধ্যাবেলায় শুধু চা কি দেওয়া যায় কাউকে, না মন দিতে চায়।'—

হ্যাঁ, সম্ভবত তাই চায় আজকের কলকাতা। কেননা, লোকে বলে, সুদিনের সেটাও একটা লক্ষণ।—সুদিন ?—হ্যাঁ, সুদিন বৈকি। নয়ত মহাযুদ্ধের বহুকাল পরে কতকাতার পথে পথে কেন আজ সহস্র স্ট্রীট-ওয়াকার ? বার-এ রেস্তোরাঁয় কেন আজ শত শত ছদ্মবেশী নাগরিকা এবং কেনই বা লোকে বলে—অন্ধকারে বিচরণশীলা নারীরা আজ এখানে সংখ্যায় 'কমসে কম তিরিশ হাজার'!

শুধু বড় খাতার হিসেব নয়, তারপরেও মার্জিনে আরও কিছু

কিছু হিসেব আছে, কথা আছে। কলকাতায় বিস্তর হোটেল আছে, ইদানীং 'নাচা আউর পাত্তা কা' আখড়া হয়েছে অসংখ্য। তদুপরি দিনেরবেলায় পতিত ভুতুড়ে নামে কথিত বাড়ি আছে এবং আছে 'ভদ্রলোকের বাড়ি' চিহ্নিত বিস্তর অসহায় গৃহস্থ ঘর, পাড়ার লোকেরা ব্যঙ্গ করে নাম দিয়েছে যাদের—হাফ-গেরস্থ। এদের অনেকেরই দেওয়ালের আড়ালে কাহিনী রয়েছে এবং সে কাহিনী কলকাতার সেই তথাকথিত সুদিনেরই কাহিনী।

মামলার রায় বেরিয়ে গেছে। একটি অভিজাত পাড়ার এক হোটেল-পরিচালকের জন্যে কারাবাস নির্দিষ্ট হয়েছে। অপরাধ—হোটেলে খানাপিনার সঙ্গে তিনি অন্য কিছুও বেচতেন। নানা দেশের নানা জাতের পণ্য।

নগরের পূর্বাঞ্চলের সেই হোটেলটির নামেও একই অভিযোগ। সেখানেও খাবারের সঙ্গে মানুষ বিক্রি হত!

বোম্বাইয়েয় একটি কাগজে জনৈক বিদেশী সে বিক্রির কলা-কৌশল সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। তাতে জানা যায় হংকংয়ের মত বোম্বাই কলকাতায় দরও রীতিমত সস্তা।

সম্ভবত কথাটা সত্য। খবরটা শহরের পূর্বাঞ্চলের যে হোটেলটির কথা বলা হল সেখানে পঞ্চব্যঞ্জন সমন্বিত এক ডিস ভাতের দাম ছিল মাত্র বারো আনা। এবং চিত্তরঞ্জন এভিন্যু, ওয়াটগঞ্জ, বেন্টিক স্ট্রীটের যে চায়ের দোকানগুলোর কথা বলেছি তাতে কাজ করে যে মেয়েরা তারা মাইনে পায়। দৈনিক বারোঘণ্টা খাটুনির বদলে মাসে মাত্র তিরিশটি টাকা।

হতে পারে—দৈনিক মোটে এক টাকা। কিন্তু মনে রাখতে হবে ক'বছর আগেও কলকাতা এ খবরটা জানত না। অপচয় করার মত এই পয়সাটা সেদিন তার হাতে ছিল না। মেজাজটা ত নয়ই নয়।

কেন এল, কোত্থেকে এল—সে সব কথা পরে। তার আগে নতুন মেজাজের শহরের যে নতুন জীবনী সেটাই শেষ হক।

পৃথিবীর সব শহরের মতই অন্ধকার চিরকালই ছিল এই শহরে। কিন্তু সেই আঁধার পুরীর শিয়রে জ্বলত—পুলিসের ভাষার যাকে বলে —'লাল আলো' সেই—'রেড লাইট'। মাঝরাত্তিরের হাওয়ায় লাল আলোর এলাকায় তখন নূপুর বাজত, অট্টহাসির রোল উঠত। সভ্যতাকে খালি গায়ে দেখা যেত। কিন্তু আজ আর তা দেখবার উপায় নেই। কেননা আইন আছে এবং কলকাতা ইতিমধ্যে আরও অনেক বেশী ধূর্ত হয়ে গেছে। নয়ত এক সপ্তাহে কখনও সরকারী দোকান থেকে পাঁচশ' আইনের বই বিক্রি হয়?

১৯৫৮ সনের মে মাসের খবর। কলকাতায় সেবার 'বেস্ট-সেলার' যে বইটি সেটি একটি আইনের বই। নাম—'সাপ্রেসান অব ইমরাল ট্রাফিক অ্যাক্ট,—১৯৫৬'। দিল্লীর মত হাওড়া এবং কলকাতা হুগলীর দুই তীরেই সেদিন জনসভা হয়েছিল বটে, কিন্তু আসল সিদ্ধান্ত পাওয়া গিয়েছিল সেই ছোট্ট বইটি থেকেই। তাতে জানা গিয়েছিল—মন্দির মসজিদ স্কুল বা ভদ্র বাড়ির দুশ' গজ দূরে হলে —সবই চলতে পারে। তবে, কিঞ্চিৎ সতর্কতা সহ। অর্থাৎ, হয়ত তার আগে নকল একটা সংসার সাজাতে হবে, কিংবা ইউ. পি'র কায়দায় কোন অভিভাবক দাঁড় করাতে হবে—কিংবা অন্য কোন উপায় নিতে হবে।

যেহেতু পুরানো কায়দায় 'ম্যাসেজ বাথ' সাইনবোর্ড টানিয়ে স্বাস্থ্য নিকেতন গড়ে তোলা আর সম্ভব ছিল না সেইহেতু এল নতুন সাইনবোর্ড, সৌখিন থিয়েট্রিক্যাল ক্লাব। (অবশ্য এই শিরো-নামায় যে কোন উদ্যমই যে একই কারণপ্রসূত নয়—সে কথা বলাই বাহুল্য)। এবং তারপরও যাদের জায়গা হল না পশ্চিমের কায়দায় সরাসরি তারা নেমে এল—পথে। ঘুঙুর এখন রাস্তায় রাস্তায়, চলমান ট্যাক্সিতে ট্যাক্সিতে!

দিল্লি-বোম্বাইয়ে অসহায় আইনটির আজ তাই নাম হয়েছে— 'সীতা' ('Suppression of Immoral Traffic Act'-এর প্রথম

অক্ষরগুলো যোগ করুন, তাই হয়)। সে আইনে পূর্বের সেই রামরাজত্ব আর নেই বটে, কিন্তু অশোক কানন ঠিকই আছে। দিনে দিনে সে যেন ক্রমেই আজ পত্রপুষ্পে আরও মঞ্জরিত হয়ে উঠেছে। কেননা, নীচের এই খবরগুলো মাত্র গেল মাসে পাওয়া গেছে।

প্রথম সংবাদ ঃ বোম্বাইয়ে কিছু 'কলেজ গার্ল' পুলিসের হাতে ধরা পড়েছে। তারা বই নিয়ে কলেজে যেত লেখাপড়া শিখতে নয়, লেখাপড়া-জানা মেয়ে ধরতে।

দ্বিতীয় সংবাদ ঃ বোম্বাই পুলিস দুটি সুদর্শনা ইংরেজ তরুণীকে জোর করে পশ্চিমের প্লেনে তুলে দিয়েছে। কেননা, জানা গেছে তারা 'ভারত নাট্যম' শিখতে আসেনি,—এসেছিল অন্যভাবে টাকা রোজগার করতে।—'কালচার' আজ সত্যিই—জীবনের চেয়েও কঠিন কলা !

তৃতীয় সংবাদ ঃ অন্ধ্র প্রদেশের তেলেঙ্গানা থেকে লাম্বাদি মেয়েরা হামেশাই হারিয়ে যাচ্ছে। তৎসহ স্টেট ট্রাইব্যুনাল এনকুয়ারি কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী ভি রাঘবিয়ার চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট ঃ তারা পাঞ্জাবে বারশ' থেকে দু'হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে। কেননা, 'ফোক-আর্ট' ফোক-ড্যান্সের মত—সবল সমর্থ গ্রাম্য মেয়েদেরও এখন সভ্যতার দরবারে চাহিদা বিস্তর !

চতুর্থ খবরটি জানিয়েছিলেন ভারত সরকার নিযুক্ত 'অ্যাডভাইসারি কমিটি অব সোস্যাল এণ্ড মরাল হাইজিন' কমিটির চেয়ারম্যান দুর্গাবাঈ দেশমুখ। কলকাতা সহ ভারতের একশ আঠারটি 'নারী আশ্রম' ঘুরে এসে তিনি জানিয়েছিলেন—তার অধিকাংশই এক এক ধরণের পতিতালয়। কোথাও জোর করে ধরে এনে মেয়েদের সেখানে ঘৃণ্য জীবনে বাধ্য করা হয়, কোথাও নিয়মিতভাবে বিয়ের নামে মেয়ে বিক্রি করে টাকা রোজগার করা হয়, কোথাও বা সেগুলো পরিচালকদের দ্বিতীয় অন্দর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উল্লেখযোগ্য, কলকাতার আদালতেও সে কাহিনী অপরিচিত নয়।

পঞ্চম খবর : গেল ৯ই ডিসেম্বর ১৯৬১ বাঙ্গালোরে মাণিক্য নামে এক সুদর্শন তরুণ সাধু পুলিসের হাতে ধরা পড়েছে। সে চল্লিশটি সম্ভ্রান্ত মেয়ে এবং মহিলাকে নিয়ে সেখানে এক ধর্মসভা বসিয়েছিল। কিন্তু জানা গেছে সেটি আসলে একটি পাপচক্র মাত্র। মেয়েরা সেখানে অলৌকিক আকর্ষণেই আসতেন, কিন্তু লৌকিক কারণে অতি অল্পসংখ্যকই স্বাভাবিকভাবে তাঁদের ঘরে ফিরতে পারতেন।

সুতরাং বলা নিষ্প্রয়োজন,—পথ যেখানে এমন সহস্রমুখী,—আইন সেখানে অনিবার্যভাবেই বন্দিনী 'সীতা'। তাছাড়া, এ 'সীতা' রাজর্ষি জনকের নন্দিনী নন,—দ্বিধাগ্রস্ত শিথিল হাতের রচনা। ফলে—নিজের লুকোচুরির নেশাও তার স্বভাবজ। বিশেষজ্ঞরা বলেন এ আইনের যত ফাঁকি আছে—হাজার-দুয়ারীতেও তত দরজা নেই।

প্রশ্ন : রাতারাতি এত মেয়ে কোথা থেকে এল আজ ? কোথা থেকে আসে ? উত্তরটা প্রশ্নটার মতই পুরনো।—সুসজ্জিত এই অরণ্য থেকে। যুদ্ধ গেছে। দেশ-বিভাগ গেছে। দাঙ্গা গেছে, বন্যা গেছে,—গ্রাম গেছে, মধ্যবিত্ত গেছে।—জীবনের পুরানো কানুন সর্ব ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে। এখন কল এসেছে, রিফিউজি কলোনি এসেছে, প্রখরতর সিনেমা, দরখাস্তের দীর্ঘতর লাইন তথা কঠিনতর জীবন—এসেছে। একশ তিরিশ টাকায় এখন শুধু একটি সুশিক্ষিতা সুদর্শনা মধ্যবিত্ত কন্যাকে একঘর নানাবিধ মানুষের মধ্যে দশটা থেকে পাঁচটা অবধি বসিয়েই রাখা যায় না, ইচ্ছে করলে নানা বাঁধনে রাত ন'টায়ও তাকে চায়ের দোকানে বা সিনেমায় পাশের সীটে বসিয়ে রাখা যায়। আলোক-প্রাপ্ত এবং মোটামুটি সামাজিক পরিচয়সম্পন্নদের ক্ষেত্রেই যখন অবস্থা এবম্বিধ, তখন অসহায় উদ্বাস্তু ঘরের জন্যে আর সমবেদনা দেখিয়ে লাভ কি ? কি লাভ মধ্যপ্রদেশের বিলাশপুর রায়পুরের যে

মেয়েরা হাট সাজায় কলকাতায় হাওড়ায় তাদের নামেই বা মায়াকান্না কেঁদে ?

মাত্র দিন কয় আগে এলিয়ট রোডে অল বেঙ্গল উইমেন্স ইউনিয়নের সম্মেলনে একজন বক্তা যে হিসেব দিয়েছেন, এ প্রসঙ্গে তা শুনবার মত। অন্ধকার গলিতে গলিতে একশ কুড়িটি মেয়ের কাহিনী মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলেন—ওঁরা। তার মধ্যে কুড়িজন এসেছে বিদেশ থেকে। বহু দূর-দূর দেশ থেকে। (কেননা শ্বেত-ক্রীতদাসীদের নিয়ে পৃথিবীর প্রাচীনতম ব্যবসাটি এখনও তেমনি আন্তর্জ্জাতিক!) দ্বিতীয় দলে আছে—আটাত্তরজন। তারা সবাই এদেশীয়।—অবশ্য নানা জাতির। এ পথে আসার কারণ, রকমারী। শ্রেণী-বিভাগ করলে তা তিন শ্রেণীর। প্রথমত—পিতামাতা, দ্বিতীয়তঃ—হৃদয়হীন সমাজ (এখনও অপহৃতা বহু মেয়েকে বাপ-মা ঘরে তোলে না) এবং তৃতীয়—প্রবঞ্চক দেশ। কোন মেয়ে ঘর ছেড়েছিল সিনেমায় নামবে বলে, কেউ নিজের পায়ে দাঁড়াবে বলে, কেউ স্বপ্নের মত একটি ঘর পাবে বলে। কিন্তু হায়, আজ তারা প্রেতলোকবাসী! একমাত্র দশটি মেয়ে নাকি বলেছিল তারা এ জীবনেই প্রকৃত পরিতৃপ্ত।

তৃপ্ত কলকাতাও। কারণ অসংখ্য মেয়েকে আজ সে দিতে পেরেছে এক অনাস্বাদিত তৃপ্তির সন্ধান—নাম যার কাঁচা পয়সা!

কিন্তু সে পয়সা কি শুধুই জীবনধারণের জন্যে? কদিন আগে মাদ্রাজে নিখিল ভারত সমাজসেবী সম্মেলনে ঘোরতর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন—ভারতের একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং বর্তমান ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডলীর অন্যতমা সদস্যা ডাঃ সুশীলা নায়ার। তিনি বলেছেন: 'উইমেন হু সিন ফর ইকনমিক রিজনস আর স্লোলি বিয়িং টার্নড আউট অব দি জব বাই উইমেন হু সিন ফর প্লেজার।'

ইত্যাদির সঙ্গে আজ চিন্তনীয় বিষয় বোধ হয় সেইটেই।

একটি আন্তর্জাতিক ব্যবসা

কেনা আর বেচা। অর্থাৎ—ব্যবসা। সুতরাং আর সব ব্যবসায়ের মত এখানেও লাভ-লোকসানের প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। কিন্তু তা ওঠে না। বাজেট-বিতর্কে কখনও এ-ব্যবসায়ের 'তেজী-মন্দার কথা শোনা যায় না, কখনও অদৃশ্য এ শ্রেষ্ঠীকুলকে দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত হয়ে লাইন-বদলের কথা ভাবতে দেখা যায় না। কেননা, ঝক্কি-ঝামেলা, আনন্দ-উত্তেজনা, ভয়-ভাবনা আছে অবশ্য কিন্তু এ বাণিজ্যে কোনদিন লোকসান নেই, লোকসান হয় না। চিরকাল এখানে লক্ষ্মী অচলা। কেননা, খদ্দের যেমন এখানে অনেক, বাজারটিও তেমনি যথার্থই আন্তর্জাতিক। জলের তলা দিয়ে যারা আনাগোনা করে সেই মীনকুলের যেমন সুয়েজখালে শুল্ক দিতে হয় না, তেমনি এই অন্ধকারের ব্যাপারীদেরও আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের বিধিনিষেধ পোয়াতে হয় না। পুঁটুলীতে কি আছে জানা মাত্র—দেশে দেশে কপাট তাদের জন্যে সদা উন্মুক্ত। এ হাট সত্যিই সব দেশে এক—কমন মার্কেট।

বিক্রির ছলাকলা সম্পর্কে শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন যা গত মে (১৯৬২) মাসে বলেছেন সেটা অসংখ্য কেতাবে-কথিত রহস্যমালা সিরিজের একটা পাতা মাত্র। বিয়ে করে বৌ নিয়ে ব্যাপারী জাহাজে চাপল। এডেনে খোল খালাস করে দু' মাস পরে আবার বোম্বাইয়ে ফিরে এল। এবার তার আবার সাদী হবে এবং বিবি নিয়ে আবার জাহাজে চড়বে। তারপর আবার। তিন ট্রিপে চার পুরুষের রোজগার।

যে দেশে বরের বাজার চড়া এবং যে দেশে কনের বাড়ীতে প্রায়ই হাঁড়ি চড়ে না সে দেশের পক্ষে কৌশলটা বেশ সুবিধেজনক সন্দেহ নেই। কিন্তু বলা নিষ্প্রয়োজন, অন্যত্র এই ওরিয়েণ্টাল-ছলের বিয়ের

কদর নেই। তাঁরা অন্য পথ ধরেন। এমন পথ যা আণ্ডার-ডেভা-লাপড দেশের থেকে স্বতন্ত্র—আধুনিকতার সমান্তরাল। যথা ঃ হঠাৎ লণ্ডনের গোটা দুই-তিন জনপ্রিয় কাগজে বিজ্ঞাপন বের হবে এডেন কায়রো এবং বেইরুতের বিখ্যাত ক'টি নাইটক্লাবের জন্য কতিপয় সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী এবং নৃত্যগীত-পটিয়সী তরুণী চাই।

ঐ প্রস্তাবের আধুনিক নাম—'শো বিজনেস'। সুতরাং দিস্তার পর দিস্তা দরখাস্ত পড়বে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সারির মেয়েরা নতুন করে তালিম নিয়ে ইণ্টারভিউ দেবে। তারপর অ্যাডভান্সের পাউণ্ড শিলিংগুলো 'মামি'র হাতে তুলে দিয়ে এজেণ্টের সঙ্গে প্লেনে চড়বে। নামা মাত্র দেখা যাবে মধ্যপ্রাচ্যের তৈলচিক্কণ তেলের বাদশারা তাদের অপেক্ষায় রাত্রির মধ্যযাম পর্যন্ত জেগে বসে আছেন।

আরব্য রজনীর সে আয়োজনে লণ্ডনের সে মেয়ে কখনও পেছনের সারিতে দাঁড়িয়ে নাচের সময়ে পা নাড়াবে, কখনও বা কোরাসে শুধু ঠোঁট নাড়াবে। ফলে বাদশাদের দেশে তার নর্তকী হিসেবে খ্যাতি যত—তার চেয়ে খ্যাতি হবে অঙ্গ-সৌষ্ঠবের। এবং তারই ফলে ক'দিন যেতে না যেতেই আসবে চুক্তির বদলে স্বাধীন জীবনের প্রস্তাব, চকচকে ডলার সাজান রেকাব। লোকে বলে বেইরুতে, লেবাননে, জর্ডনে, সৌদিআরবে যে ইংরেজ-ফরাসী মেয়েদের নিয়ে আজকের আরব্যরজনী, তাদের অধিকাংশই এ-পথে আমদানি। 'শো বিজনেস'-এ দর্শনীয় হতে এসে ব্যবসায়ের জাল কেটে বের হতে পারেনি বেচারারা।

দক্ষিণ আমেরিকা, পশ্চিম এবং দক্ষিণ ইউরোপ, বিশেষ করে ফ্রান্স, ইতালী, স্পেন এবং পর্তুগালের বহির্বাণিজ্য, আজ নাকি প্রধানত এই সাংস্কৃতিক পথ ধরেই চলে। 'শো-বিজনেস'-এর সুন্দর পর্দার আড়ালেই সেখানে 'শ্বেত-বাঁদীদের জমজমাট হাট বসে, বাণিজ্য চলে। কেননা, ব্যবসা হিসাবে এ কেনা-বেচা বিশ্বের প্রায় সমবয়সী হলেও হালের খদ্দের সনাতন কালের মত নয়। তাঁরা

লেবেল মোড়কগুলোও পছন্দমত চান! ফলে গেল বছর বোম্বাইতে নাকি দুটি পশ্চিমী মেয়ে এসে নেমেছিল ভারতনাট্যমের ভঙ্গী নিয়ে। মধ্যপ্রাচ্যের শেঠেদের মত আর্যাবর্তের শেঠেরাও নাকি তাই পছন্দ করেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, ফেরার পথে তাদের হ্যাণ্ড-ব্যাগে যে পরিমাণ আমাদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ছিল সেটা নাকি শুধু নাচ দেখিয়ে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়!

অবিশ্বাস্য ধরনের ব্যবসা। শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন জানেন না—সস্ত্রীক বিদেশগমনে বাধা দিলেই এ বাণিজ্য বন্ধ হবে না। কেননা, এ-ব্যবসা শুধু দুটো চেনা পথ ধরেই চলে না। দু' বছর আগের লণ্ডনের একটি কাহিনী শুনলেই বোঝা যাবে এ বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠিত যারা তাদের আসন থেকে নামিয়ে আনা কেমন কষ্টকর সাধনা।

গুইসেপ্পো মেসিনা নামে সিসিলিতে এক 'সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক' ছিলেন। তিনি কি করে এত অর্থ রোজগার করেছিলেন বাইরের লোক কেউ-ই তা জানত না। কিন্তু পৈত্রিক ব্যবসা, সুতরাং বাড়ীর ছেলেদের কাছে তা গোপন ছিল না। ভদ্রলোকের পুত্র-সন্তান ছিল পাঁচটি। পিতার মৃত্যুর পর তারা নির্দ্বিধায় পারি-বারিক ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হল। সকলের কর্মকেন্দ্র একই এলাকা, উত্তর আফ্রিকা।

আধুনিক উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যবসায়ী। সুতরাং তারা বেশীদিন আফ্রিকাকে নিয়ে বসে থাকতে রাজী হল না। পাঁচ ভাই ছড়িয়ে পড়ল পাঁচ দেশে। ঠিক যেন পাঁচটি আধুনিক 'টাইফুন' নতুন নতুন রাজত্বের সন্ধানে বিদেশে বেরিয়েছে।

এক ভাই সালভাতোর মেসিনা ধরা পড়ে মিশরে। অন্য চার জন আলফ্রেদো, ইউজিন, আত্তিলিও এবং কার্মেলো নির্বিবাদে বাজার জমিয়ে বসল যথাক্রমে ফ্রান্স, স্পেন এবং ইতালীতে।

১৯৩৪ সনে ইউজিন হঠাৎ এসে হাজির হল লণ্ডনে।

পাশপোর্টে তার সঠিক পরিচয়, সে ব্যবসায়ী কিন্তু কিসের ব্যবসা তার সে খবর করার আগেই নজর থেকে হারিয়ে গেল সে। এক বছরের মধ্যে বাকী তিন ভাই এসে যোগ দিল দাদার সঙ্গে। মহাযুদ্ধে চার ভাই আট হাতে টাকা কুড়াল। তারপর বেশ পাকাপোক্তভাবে বসে গেল লণ্ডনে। এখন তারা আর সিসিলির লোক নয়, খাঁটি ইংরেজ। তাদের কারও নাম—রেমণ্ড, কারও নাম চার্লস। তাদের চারজনের চার ঠিকানা, চার পরিচয়। কেউ—হীরে ব্যবসায়ী, কেউ দুর্লভ শিল্পবস্তুর কারবারী, কেউ এক্সপোর্টার, রপ্তানিকারী। মানে খতিয়ে দেখলে তারা মিথ্যে বলেছে এমন কথা কেউ বলতে পারবে না। কিন্তু পুলিসের তখন সে নজরে তাকাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কারণ প্রত্যেকের ঠিকানা তখন মস্ত মস্ত হোটেলে, প্রত্যেকের দুয়ারে বাঁধা দামী রোলস রয়েস। তাছাড়া, অভিজাত ঘরের সন্তান কিনা—দামী পোশাকে ওদের দেখায়ও চমৎকার। দেখে কেউ ভাবতেও পারবে না, নানা দেশের দু'শ শ্বেত-বাঁদীর রাত্রির মূল্যে ওদের সংসার।

১৯৪৭ সনে আর এক ব্যবসায়ীকে ক্ষুর দিয়ে হত্যার চেষ্টায় গ্রেপ্তার হল ইউজিন। বিচারে তার জেল হল বটে কিন্তু ব্যবসা বন্ধ হল না। কারণ, অন্য ভাইরা তখনও বাইরে রয়েছে।

হঠাৎ দুয়ার বন্ধের তাড়া এল ১৯৫০ সনের এক রোববার ভোরে। চার ভাইয়ের মধ্যে তিন জনেরই ছবি ছাপা হয়ে বের হল লণ্ডনের একটা কাগজে। তৎসহ মেসিনা-ভ্রাতাদের বিস্তারিত কাহিনী! জনৈক সাংবাদিক গোয়েন্দার মত বিন্দু বিন্দু করে সংগ্রহ করে সেই অবিশ্বাস্য ব্যবসার কথা জানিয়েছেন পুলিস এবং লণ্ডনবাসীকে।

পরদিন তিন ভাই পালিয়ে গেল দেশ থেকে। চতুর্থ ভাই শহর থেকে ঠিকানা পালটে উঠে গেল শহরতলীতে। ন' বছরের চেষ্টায়

অবশেষে ধরা সম্ভব হল তাদের। কেউ ধরা পড়ল লণ্ডনেই—কেউ বেলজিয়ামে। তবে সবাই একসঙ্গে নয়। ইউজিনকে জেলে দিয়ে ফেরার পথেই লণ্ডনবাসী আবার কাগজে সংবাদ পেল—বেলজিয়ামের একটা সেলে বসে কার্মেলো হোটেল, রেস্তোরাঁ এবং আবোলতাবোল সব মানুষের নামে চেক লিখছে। সে চেকে যাদের নাম-ঠিকানা তারা সব সুদূর দক্ষিণ আমেরিকায় থাকে!

প্রশ্ন উঠতে পারে মেসিনো-ভাইরা এত মেয়ে জোগাড় করত কি করে? যে মেয়েটি ওদের খবর প্রথম খবরের কাগজের কানে তোলে সে বলেছিল—'সে কথা বুঝিয়ে বলার মত নয়। জীবনে সেই যেন আমার প্রথম মনে হয়েছিল—সত্যিই কেউ যেন চাওয়ার মত করে আমাকে চাইছে। এমন আন্তরিক কণ্ঠস্বর এর আগে আমি কখনও শুনিনি—আই সেইড টু মিসেলফ আফটার আওয়ার ফার্স্ট মিটিং—'দিস ইজ এ জেণ্টলম্যান'!'

বোম্বাইয়ের জনৈক মতিচাঁদের মুখের দিকে তাকালেও নাকি প্রথম প্রথম একই কথা মনে হত আশপাশের লোকেদের। মতিচাঁদ ওর আসল নাম নয়, গেল বছর পুলিসের হাতে ধরা পড়ার পর থেকে তাকে এই নামটি দিয়েছিল বোম্বাইয়ের একটি কাগজ।

অভিজাত মেরিণ ড্রাইভ থেকে নানার চক অবধি রাশি রাশি প্রথম শ্রেণীর ফ্ল্যাট ছিল এই মতিচাঁদের। কিংবা বলা যেতে পারে—'—চেন স্টোর'। সে সব ফ্ল্যাট শীতাতাপ-নিয়ন্ত্রিত, দামী আসবাবে সুসজ্জিত। তার ঘরে ঘরে টেলিফোন, দুয়ারে গাড়ীর সারি। মতিচাঁদ নাকি এ-ব্যবসায়ের নাম দিয়েছিল 'হোস্টেজ সার্ভিস'। সন্ধ্যার পর অতিথিরা আসতেন, নগরের সেই সব আধুনিক বিত্তবানেরা—নাম যাঁদের 'এক্সপেন্স একাউন্ট'। মতিচাঁদের চাঁদের হাটে তাঁরা কোম্পানির বাড়তি টাকা উড়িয়ে ঘরে ফিরতেন! মতিচাঁদের তখন বোম্বাইয়ে নাকি জবর খাতির!

শোনা যায় মতিচাঁদ এই হাট সাজিয়েছিল যাদের দিয়ে তারা

সব সংগৃহীত হত অন্য উপায়ে, বিজ্ঞাপনের হাতছানি দিয়ে। ফ্যাশান মডেলের জন্যে বিজ্ঞাপন ছাপাত মতিচাঁদ। তারপর অতি সাবধানে জালটা টানতে টানতে ডাঙ্গায় তুলে ক্রমে ফ্ল্যাটে তুলত!

বোম্বাইয়ে আর এক উদীয়মান ব্যবসায়ী ছিল নাকি যম্‌নাদাস। শোনা যায়, তার হৃদয়ের তুলনা ছিল না। কলকাতা-দিল্লি-হায়দ্রাবাদ—সারা ভারত থেকেই সে নানা প্রলোভন দেখিয়ে মেয়েদের বোম্বাইয়ে টেনে আনত। তারপর নিজের খরচে হোটেলে রেখে ধীরে ধীরে আসল কথাটা পাড়ত। যারা তারপরেও ফিরতে চায় যম্‌নাদাস নিজের খরচায় তাদের ফেরত পাঠাতে রাজী আছে। কিন্তু হায়, কেউ ফিরত না। ফিরে যাওয়ার পথই যদি থাকে, তবে এখানে আসা কেন? সুতরাং, 'যদি সিনেমায় নামতে পারি,' 'যদি মডেল হতে পারি, কিংবা 'যদি কারও চিত্তে ঢেউ তুলতে পারি'—নানা রকমের স্বপ্ন দেখতে দেখতে ওরা চোখ বুঁজে পড়ে থাকত। তারপর ক্রমে একদিন স্বপ্ন চলে যেত এবং ওরাই শুধু থেকে যেত!

যম্‌নাদাসের সেই সাজান বাগানে একটি ফুল ছিল গোয়া থেকে সংগৃহীত। বেচারা জনৈক পাদ্রীর মেয়ে। তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল—ধার্মিক মা-বাবার মেয়ে হয়েও এ পাপের জীবনকে মেনে নিলে কি করে?

মেয়েটি উত্তর দিয়েছিল—ঈশ্বরকে ত আমি ত্যাগ করিনি—জান, আমার রান্নাঘরে কাউকে আমি ঢুকতে দেই না।

'আমি আমার ছেলেমেয়েদের কাছে ফিরে যাব।'

'আমি কোথাও যাব না। যদি কোনদিন দরকার হয় এখানেই ভিক্ষা করব।'

'—ভবিষ্যতের জন্যে ভাবি না,—ঈশ্বর রয়েছেন।'

নৈতিক এবং সামাজিক স্বাস্থ্য সংস্থার কর্মীদের প্রশ্নের উত্তরে তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি তাই জানিয়েছিল যমুনাদাস আর মতিচাঁদেরই আর এক মহল 'ঘরওয়ালীদের' ঘরের বাসিন্দাগণ।

মোট তের হাজার মেয়ের মধ্যে মাত্র সাড়ে তিনশ'র সঙ্গে কথা বলেছিলেন তাঁরা। তাতে দেখা গেছে—বাইরে থেকে রক্তালোক উদ্ভাসিত সেই এলাকাগুলোকে যা মনে হয়, ভেতরে ঠিক তা নয়। অধিকাংশ নারীর মাসিক রোজগার সেখানে মাত্র পঞ্চাশ থেকে একশ' টাকা। একমাত্র তারাই একটু সচ্ছল নাম যাদের—নাইকান। তারা সবাই কম-বেশী নাচগান জানে এবং তাদের শতকরা প্রায় ৭৬ জন লিখতে-পড়তেও জানে। ফলে 'শেঠ'রা নাকি তাদের মাসে দু'শ' তিনশ টাকা দিয়ে কিনে রাখে। এমনকি কোন কোন 'শেঠ' তাদের সঙ্গে নিয়ে পার্টিতেও নাকি যোগ দেয়। কেননা, ওদের মাঝবয়সী স্ত্রীরা আধুনিকা নন! তাই কি 'নাইকান' গর্ব বলে—আমি কোথাও যাব না!

প্রশ্নটার উত্তর দেওয়ার আগে তথ্যগুলো আরও একটু নেড়েচেড়ে দেখা দরকার। বোম্বাইয়ের মত কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সোস্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্টও কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন কলকাতার 'রেডলাইট' এলাকাগুলো সম্পর্কে। তাঁরা কথা বলেছিলেন পাঁচশ' মেয়ের সঙ্গে। তাতে জানা যায় এ শহরেও অধিকাংশ যমুনাদাস-শিষ্যাদের মাসিক আয় গড়ে একশ' টাকা মাত্র। অবশ্য কিছু কিছু এখনও আছে যাদের খেয়ে খর্চেও মাসের শেষে আঁচলে দু'হাজার টাকার বেশী থাকে। কিন্তু তাদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য! সুতরাং, বোম্বাইয়ের মত এখানেও তবে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক—মতিচাঁদের তবুও কেন এ ব্যবসায়েই মতি! ধরে নিলাম মতিচাঁদ আর মতিজান দুইয়ের

লাভের হার সমান নয়। তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায় তবে ওরা সুযোগ পেয়েই ফিরে আসছে না কেন?

কিছুদিন আগে কলকাতারই আর একটি সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান 'অল বেঙ্গল উইমেনস ইউনিয়ন' ১২০টি মেয়ের সামনে প্রশ্ন নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ২০ জনই ছিল ভারতের বাইরে—অর্থাৎ ইউরোপ-আফ্রিকা থেকে আগত। বাকীদের মধ্যে ১০ জন মাত্র উত্তর দিয়েছিল—স্বেচ্ছায় আমরা এপথে এসেছি এবং এ জীবনে সত্যিই আমরা আনন্দিত। মাত্র দু'জন বলেছিল—পথ পেলে আমরা বেরিয়ে আসতে রাজী! হ্যাঁ ১২০ জনে মাত্র দু'জন!

ওরা ফিরতে চায় না।

কারণ ফেরার পথ থাকলে আসার প্রশ্ন উঠত না। অন্তত অধিকাংশের ক্ষেত্রে তাই ঘটনা। উল্লিখিত বোম্বাইয়ের সেই রিপোর্টটির (A Study of Prostitutes in Bombay—By S. D. Punekar Kamala Rao) মতে যে ৩৫০টি মেয়ের সঙ্গে তাঁরা কথা বলেছেন তাদের অধিকাংশই এপথে পা বাড়িয়েছে বারো থেকে পনেরো বছর বয়সের মধ্যে। এদের মধ্যে শতকরা ৩২ জন 'দেবদাসী' অর্থাৎ জন্ম থেকেই মতিচাঁদ আর যমুনাদাসদের বাঁদী। অন্যদের মধ্যে ১৪০ জন বিবাহিত এবং ৯৭ জন কুমারী। বিবাহিতাদের মধ্যে শতকরা ৭৬ জনেরই বিয়ে হয়েছিল পনেরো বছর বয়সের আগে, শতকরা ৬৫ জনের আরও কম বয়সে। বলা নিষ্প্রয়োজন, তাদের বয়স ষোলয় পৌঁছাবার আগেই শতকরা ৫০ জন বিধবা হয়ে যায়। সহায়-সম্বলহীন সেই তরুণী বিধবাদল ফিরবে কোথায়? শুভানুধ্যায়ীরা তাদের যে এ পথেই নামিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হয়েছিল একদিন!

বিধবা এবং স্বামী-পরিত্যক্তরা এখানে আসে অধিকাংশ সময়েই আত্মীয় বা বন্ধুদের হাত ধরে। অসহায় কুমারীরা কখনও

'প্রিয়জনের' সঙ্গে কখনও 'পাপ' ঢাকবার জন্যে, কখনও বা কাজের সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে হঠাৎ এই কড়কড়ে মুদ্রার আওয়াজ শুনে। সুতরাং, তারা ফিরতে চায় না। আর চাইলেই বা তার পথ কোথায় ?

এদের সামনে পথ নেই বলেই যমুনাদাস-মতিচাঁদের সামনে আজ—আশ্চর্য দুনিয়া, দিনও এখানে মনে হয় যেন রাত।

মাসকয় আগের খবর।

অন্ধ্রের ট্রাইবুনাল এনকোয়ারী কমিটির চেয়ারম্যান মিঃ ভি. রাঘবিয়ার কথা শুনে চমকে উঠেছিল গোটা ভারত। তিনি জানিয়েছিলেন—অন্ধ্র থেকে ক'মাসে কয়েক কুড়ি মেয়ে চালান গিয়েছে পাঞ্জাবে।

খবরটা প্রথমে যে স্বদেশের কানে তুলেছিল সে লাম্বাদীদের ঘরের একটি মেয়ে। তেলেঙ্গনা জেলার এই মেয়েরা তাদের বন্য রূপের জন্যে দক্ষিণে সুপরিচিত। এই মেয়েটির নাম ছিল—রামুলাম্বা। সুদূর পাঞ্জাব থেকে পালিয়ে এসে সে খবর দিয়েছিল সেখানকার আম্রি আর আসরা তালুকে হায়দ্রাবাদের অনেক মেয়ে আছে। তারা কেউ ইচ্ছে করে যায়নি সেখানে। ডাকুরা ধরে নিয়ে গেছে। নিয়ে গিয়ে নগদ হাজার-বারোশ' টাকায় বিক্রি করেছে। ওকে বেচে ছিল—দু'হাজার টাকায়।

কথাটা শোনামাত্র সুব্বমা নামে এক মা ছুটেছিল সেখানে তাঁর হারান মেয়ের খোঁজে। 'মেয়ের হদিশ সে করেছিল ঠিকই, কিন্তু 'মালিক' তাকে হঠিয়ে দিয়েছে। বেচারা কাঁদতে কাঁদতে কোন মতে নিজের প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে।—শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন জানেন, এ ঘটনা 'শেখদের দেশে' নয়, তাঁর স্বদেশেও হামেশাই হচ্ছে। যাকে বলে 'বুম'—ভারতের এই রাতের হাটেই আজ তাই দেখা দিয়েছে।

ক'মাস আগে কলকাতার কাগজেই বের হয়েছিল খবরটা।—

পুলিস বি. টি. রোডের একটি বস্তী থেকে জনৈকা তরুণীকে উদ্ধার করেছে। তাকে গয়া জেলায় ষোলশ' টাকায় বিক্রি করা হয়েছিল। সে-দাসীত্বের সাক্ষী হিসেবে যে শিশু-কন্যাটি তার কোলে আসে তাকে বিক্রি করা হয় কলকাতার এক 'বাড়ীওয়ালীর' কাছে। কিছুদিন পরে মার আবার গয়াতেই হাত-বদল হয়েছিল। সেখান থেকেই, সে কলকাতায় পালিয়ে এসেছিল। কিন্তু তবুও জাল ছিঁড়ে বের হওয়া হল না তার। পুরানো ব্যাপারীই আবার বি. টি. রোডে গুদাম-জাত করল তাকে। পুলিস সেখান থেকেই উদ্ধার করেছিল মেয়েটিকে। সেই সঙ্গে একই জায়গা থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল আরও পাঁচটি মেয়েকে! তারা বাইরে পাঠানোর অপেক্ষায় ছিল! কে জানে তারপরে কতজন মতিচাঁদের বৈদেশিক বাণিজ্যে সওদা হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য গত বছর এই কলকাতা শহরে অপহরণের ঘটনা ঘটে ৯০টি এবং নানা এলাকা থেকে মেয়ে-উদ্ধার করা হয়েছে মাত্র উনিশটি!

বলা নিষ্প্রয়োজন, এ সংখ্যা সমগ্রের ভগ্নাংশ মাত্র। কেননা, কলকাতায় সেই রাত্রির নাগরিকরা সংখ্যায় আজ প্রায় চল্লিশ হাজার। আইনের দিক থেকে তারা সকলে হয়ত 'অপহৃতা' নয়, কিন্তু মূলধন হিসেবে তারা যে যমুনাদাস-মতিচাঁদের আসল মেরুদণ্ড, সেকথা সর্বজ্ঞাত।

কথাটা আর একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। কেননা, বৈদেশিক বাণিজ্যের মত ঘরোয়া বাণিজ্যও এ ব্যবসায়ে সমান জরুরী ঘটনা। এবং 'বুম'-এর প্রথম লক্ষণ অনুযায়ী ঘরেও আজ ওদের ফলাও কারবার।

কলকাতা থেকে বিহারে বা পাঞ্জাবে একটি মেয়ে চালান দিলে কত আর পাওয়া যাবে?—বড়জোর দেড় কি দু'হাজার টাকা! মতিচাঁদ জানে তার চেয়ে ঢের বেশী পাওয়া যায় যদি এখানেই একবার গুছিয়ে বসতে পারা যায়।

ফলে রেডলাইট এলাকা আজ সম্প্রসারিত হচ্ছে। কলকাতায় 'খালি কুঠি'র সংখ্যা বাড়ছে। কেননা, তার মত ব্যবসা নাকি আর হয় না!

প্রক্রিয়াটা খুবই সহজ। প্রথমেই অভিজাত কোন পল্লীতে, একান্ত যদি না পাওয়া যায় তবে কোন পাঁচমিশালী এলাকায় একটি 'কুঠি' ইজারা নিতে হবে। তারপর সেটি মনের মত করে আসবাবে অলঙ্কারে সাজাতে হবে। দিনের বেলায় সে কুঠিতে হু'জন দারোয়ান থাকবে, আর থাকবে গোটা হু'-তিন ভৃত্য। কাকপক্ষীও জানবে না ভেতরে তার কি কি আছে। রাতে এখানেই গাড়ী আসবে, রাত্রি জমবে।

পুলিসের খবরে জানা যায়—পার্ক স্ট্রীট, কীড স্ট্রীট, মার্কুইস স্ট্রীট, মেটকাফ স্ট্রীট থেকে বৌবাজার স্ট্রীটের মধ্যে কমপক্ষে আজ কলকাতায় এমনি ৩০টি 'খালি কুঠি' আছে। তার প্রত্যেকটিতে রাত্রে কমপক্ষে গড়ে ১০টি করে 'গৃহিণী' আসে এবং সে বাবদে মালিকের পকেটে আসে কমপক্ষে মাসে প্রায় চার হাজার টাকা!

টাকাটা ভাগ হয় বিশেষ এক 'কনভেনশান' অনুযায়ী। শতকরা ৩৭½ টাকা এ ব্যবসায়ের আসল যে সেই বেচারার, মাথাপিছু হু'টাকা—খদ্দের যে পৌঁছে দিয়ে গেল তার, বাকী মালিকের। সে ভাগ্যবানের আরও থাকবার কথা। কিন্তু তা থাকে না। কারণ, চাকরবাকরদের মাইনে আছে, বাড়ী-সাজানোর খরচ আছে, তাছাড়া আছে উকিল-মোক্তার পোষার খরচ। এ ব্যবসা অনেকটা জমিদারীর মত কিনা,—আইনের ঝক্কি-ঝামেলা তাই অনেক।

উপসংহারে মূলধন সংগ্রহের শেষ খবরটি। আগেই বলা হয়েছে আমাদের মত দেশে এ ব্যবসায়ের কাঁচামালের কোন অভাব নেই। এখানে কন্যা মানেই দায়, সুতরাং,—বিয়ে করে মেয়ে নিয়ে আবার সাগরপাড়ি দিতে পারে এমন পাত্র পেলে বহু মা-বাবাই বর্তে যায়।

ফলে—শেখদের ভারতীয় সুন্দরীর অভাব হয় না। এখানে এখনও সাত বছরের মেয়ের সঙ্গে ষাট বছরের বৃদ্ধের বিয়ে হয়—ফলে অনাথা বিধবার অভাব হয় না। এখানে এখনও ডাকাতে-ছোঁয়া মেয়েকে ছোঁয়া যায় না। এখনও মেয়েকে দেবদাসী সাজাতে মায়ের প্রাণে ধর্ম ছাড়া দ্বিতীয় চিন্তা উদিত হয় না। তদুপরি এখানে এখনও খেতে পায় না এমন মেয়ে গুণে শেষ করা যায় না। সুতরাং—

একদিকে যেমন এই অফুরন্ত সরবরাহের বন্দোবস্ত, অন্যদিকে তেমনি প্রবল চাহিদা। কেননা, ভারতবর্ষ সভ্য হচ্ছে। তার আকাশে কলের ধোঁয়া উঠছে। এ ধোঁয়ায় দিবারাত্রের জ্ঞান লোপ হলে বিস্ময়ের কিছু নেই। বিশেষ, কিছু মানুষের হাতে প্রতিদিন ভোরেই যেখানে যদৃচ্ছ কাঁচা পয়সা। এবং সে পয়সা ভোগের পথ যেখানে সামনে অনেক নেই! ফলে ভব্য ভারতের খোরাক জোটাতে স্বাভাবিক হাট আজ মুহূর্তে শূন্য হয়ে যাচ্ছে। নিত্য নতুনের নেশায় উন্মাদ নবীন হিন্দুস্তানের জন্যে ব্যাপারীরা—নানা জায়গায় ওত পাতছে! এ ব্যবসায়ের ট্রাজেডি সেখানেই সব-চেয়ে ঘন।—অনেককেই আজ সমাজ থেকে জোর করে কেড়ে নিচ্ছে ওরা!

সিনেমায় নামবার নাম করে হয়ত বোম্বাই নিয়ে গেল ক'জনকে, হয়ত বোম্বাই থেকে চাকরির কথা বলে নিয়ে আসা হল ক'জনকে। কিছু থিয়েটারের ঘোরে আগে-পরের দৃশ্যগুলোও অভিনয় বলেই মেনে নিচ্ছে, কিছু শাড়ি, ছবির মডেল থেকে ক্রমে জীবন্ত হতে পারবে বলে স্বপ্ন দেখে দেখে দিন কাটাচ্ছে, কিছু কিছু হয়ত বা 'কোন কোন দেশে এমন ত হয়েই থাকে' বা 'কিছু কিছু সমাজে এ ধরনের জীবন ত আছেই'—ভাবতে ভাবতে নিজের খাপছাড়া অপছন্দের অস্তিত্বটার মধ্যে একটা মেরুদণ্ড বসাবার চেষ্টা করছে! দৃশ্য অদৃশ্য নানা ফাঁদ হাতে মতিচাঁদরা আজ শিকারে নেমেছে।

শিক্ষিত, অপেক্ষাকৃত সচ্ছল, এবং জীবন সম্বন্ধে অনেকাংশে সচেতনরাই যেখানে এত সহজে এসে ধরা দিচ্ছে সেখানে—দুর্বলদের কথা অবান্তর।

তবুও, সে কাহিনীটিও শোনার উপযুক্ত। কেননা, একথা বিশ্বাস করার কোন হেতু নেই শুধু দারিদ্র্যের কারণে বা শুধু সোনার নাকছাবি দেখিয়ে চল্লিশ হাজার নারীকে ওরা এমন করে শ্রেণীবদ্ধ করে লেবেল সেঁটে দাম ধার্য করে তাকে তাকে সাজাতে পারত!

পুলিসের খবরেই জানা গেছে, মতিচাঁদের লোকেরা সাধারণত ওদের সংগ্রহ করে নগদমূল্যে আশ্রমাদি থেকে, কিংবা বিনা পয়সায় ধর্মশালা, মেলা, তীর্থস্থান রেলস্টেশন থেকে। কখনও সামনে এসে দাঁড়ায় তারা পরিত্রাতা হিসেবে, কখনও মুখোশহীন দুর্বৃত্ত হিসেবেই। এছাড়াও গোপন পথ আছে তাদের। পুরানো পাপীরা সেখানে ঝি সেজে ভাঙ্গা সংসারের খবর আনে, সখী হয়ে নতুন বান্ধবীর সন্ধান দেয়—এবং এমনি অবিশ্বাস্য সব তাদের পদ্ধতি।

তবে যত বৈচিত্র্যময়ই হোক সব পথের শেষ হয়েছে সেই রোমে, যেখানে মধ্যপ্রাচ্যের মত সেই শেখসাহেব, মতিচাঁদ আর যমনাদাসরা সাম্রাজ্যের অধিপতি এবং সতত সূর্যকরোদ্ভাসিত যে সাম্রাজ্যের গভীর অন্ধকারে আমরা থাকি।

শ্রীমতী লক্ষ্মী মেননের পক্ষে অস্বীকার করার উপায় নেই, মতিচাঁদদের সেই রোমের পথগুলো সব আমাদের উঠোন দিয়েই গেছে।

ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ ?

"Bounteous is he who gives to the Beggar."

—**Rig Veada**

"Woe to those who···makes a show of piety and give no alms to the Destitute." —Holy Koran

"Those who give to the poor lend to the Lord."

—Bible

'একটা কথা ছিল স্যার!' 'আমার সঙ্গে?' চমকে উঠে লোকটির দিকে তাকালাম। বয়স বোধ হয় চল্লিশের নীচেই হবে। গায়ে একটা লিনেন-এর পাঞ্জাবি! জায়গায় জায়গায় ছড়ে গেছে, কিন্তু অপরিচ্ছন্ন নয়। তবে বাড়ীতে কাচা। পায়ে একজোড়া কোলাপুরী। চামড়ার সেলাইয়ের ফাঁকে ফাঁকে পেরেক চিহ্ন। তলাটা ভারী হয়ে এসেছে। বোঝা যায় জুতোটার বয়েস হয়েছে। তবে এই পায়েই। কেননা, চটিটা হুবহু ওর পায়ের মাপেই।

'—আজ্ঞে, তার আগে কাইগুলি আমার পেপারগুলো যদি একটু দেখতেন স্যার!' লোকটি পকেটে হাত দিল। কিন্তু 'পেপার' নয়, হাতে উঠল একটি রুমাল। ফিকে বেগুনী রং। চৌকো করে পাট করা। একটু অপ্রস্তুত হয়েই যেন বেচারা রুমালটি হাতের জিম্মায় রেখে আবার হাত চালাল ডান পকেটে। এবার সত্যিই উঠে এল একখানা খাম, এবং তার ছেঁড়া কোণটা কামড়ে ধরে ছোট্ট একখানা পকেট চিরুনি! কিন্তু সে তখন আমার চিন্তায় তত জরুরী নয়। আমি উদ্বিগ্ন ঐ বিবর্ণ খামটির জন্য।

বিস্মিত হয়ে বললাম—'কিসের কাগজ এগুলো?—আর, আমি দেখেই বা করব কি?'

—'সবাই ত সেই কথাই বলে স্যার!—এডভাইস সকলেই দেয়!' খামটা আমার হাতে দিতে দিতে হঠাৎ যেন হাত গুটিয়ে নিল লোকটি। তারপর বিরতি স্বরূপ একটু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল —'চাকরি নেই আজ আট মাস। অথচ বিশ্বাস করবেন না স্যার, ঘাড়ে ছয়-ছয়টি প্রাণী।—পরশু সকাল থেকে কারও পেটে একটা দানা পড়েনি স্যার!'

'—কিন্তু আমি, আমি আপনাকে কাজ দেব কোথা থেকে?'

'—হুঁ, লোকটি একটু হাসল। '—তা কি আর আমি জানি না স্যার!—কত বড় বড় লোক রেকমেণ্ড করলেন—'

—'তবে?'

হঠাৎ আমার হাতটা চেপে ধরল লোকটি। '—অন্তত আজকের দিনটা চালিয়ে দিন স্যার!—ওনলি দিস ডে!' ওর গলা ঠেলে যেন কান্না উঠে আসছে। চোখে জল এসে গেছে।

তখন কাঁচা বয়স, কাঁচা মন। ছয়টি অভুক্ত নরনারীর অভিভাবককে তাই গলা ছেড়ে কাঁদবার অবকাশ না দিয়েই পালিয়ে এসেছিলাম। আসবার আগে অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গেই ওর হাতে গুঁজে দিয়ে এসেছিলাম একটা সিকি। সেদিন সারা রাস্তায় জলে-ভেজা চোখ দুটোই ছিল আমার একমাত্র ভাবনা।

কিন্তু আজ সিকিটা নিয়েও ভাবি।

কেননা, প্রায় দশ বছর পরে বেগবাগানের মোড়ে এই সেদিনও দেখে এসেছি সেই লোকটি আজও সেখানেই আছে। লোকেদের ডেকে ডেকে কাগজ দেখাচ্ছে। তাছাড়া, কলকাতার নাগরিক হিসেবে আমার অভিজ্ঞতাও ইতিমধ্যে কিছু বেড়েছে।

আপিসে বসে আছি। হঠাৎ দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল একটি লোক। কিছু বলার আগেই হাতের কাগজটা বাড়িয়ে ধরল আমার দিকে।

চোখ বোলাতেই বোঝা গেল একটা প্রেসক্রিপশন। কে বা

কার কি যেন এক অসুখ করেছে (অথবা করেছিল ?), কোন্ এক চিকিৎসক তার জন্যে ব্যবস্থাপত্র লিখেছেন। সে পত্রের চারদিকে নানা মানুষের ঠিকানা, নানা মাপের টাকার অঙ্ক।

'—আর ছ'টা ইনজেকশান হলেই—, ঐ ঘরের বাবু পাঁচ টাকা দিয়েছেন, আপনি যদি আর ক'টা টাকা দিতেন তবে ছেলেটি হয়ত বাঁচত !' লোকটি কাঁদকাঁদ মুখে ব্যবস্থাপত্রটার ব্যাখ্যা করে চলল।

পাশে বসেছিলেন বৃদ্ধ সহকর্মী। আমার হাত থেকে কাগজটা কেড়ে নিয়ে তিনি বললেন—'এ ছেলে কি আর বাঁচবে ?—ছ'বছর হয়ে গেল, একই প্রেসক্রিপশান-এ ওষুধ খাওয়াচ্ছ, সে রোগী কি কখনও তা হলে বাঁচে ?—নাও, এটা পালটে এসো !'

উল্লেখযোগ্য, লোকটি তাও এসেছিল। অবশ্য, কয়েকমাস পরে।

সবে তখন ভোর। বাসে উঠতে যাচ্ছি হঠাৎ জামার কোণটা কে যেন টেনে ধরল। পেছন ফিরে দেখি এক বৃদ্ধা। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ! বগলে একটা কাপড়ের পুঁটুলী, হাতে একটা ঝকঝকে ঘটি।

'—বাবা, কালীঘাট কি এই দিকে ?'

'—আজ্ঞে হ্যাঁ।'

মানিকতলার মোড় থেকে বুড়ী কালীঘাটের দিকে পা বাড়াল। হঠাৎ, কি মনে করে দু'পা গিয়েই ফিরে এল আবার। তারপর নীচু গলায় বলল,—'যদি কিছু মনে না কর বাবা, একটা কথা বলব ?'

'—রাস্তা কি অনেকটা হবে ?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'—বুড়ো মানুষ, কি করি বলত ?' বৃদ্ধা আমার দিকে তাকাল। '—আমার কাছে যে একটিও পয়সা নেই,—অন্তত যাওয়ার ভাড়াটা যদি দিয়ে দিতে !'

শুনেছি, ঘটি এবং পুঁটুলীসহ সেই বৃদ্ধা আজও নাকি কালীঘাটে যাওয়ার পয়সা খুঁজছে। এবং আজও নাকি গলায় চাবি-ঝোলান সেই ছেলেটিকে নিয়ে তার কাকা পিতৃদশা বাবদে চাঁদা আদায় করছে।

গল্প আর বাড়িয়ে লাভ নেই। কেননা, কলকাতা তথা বাংলা দেশে, অথবা ভারতবর্ষ নামক উপমহাদেশে যাদের বাস এসব কাহিনী তাদের অপরিচিত নয়। বরং, একটু পেছনে তাকালেই দেখবেন জন্মের পর থেকে যত রকমের প্রার্থীর মুখ দেখেছি আমরা সেই দীর্ঘ সারিতে এই তিনটি বা চারিটি মানুষ কিছুই নয়।

গায়ে ভস্ম মেখে কমণ্ডলু হাতে যে লক্ষ লক্ষ সংসার-বিরাগী শুধুমাত্র তামার পয়সা অথবা রৌপ্য মুদ্রার সন্ধানে লোকালয়ে নানাবিধ সংস্কৃত মন্ত্র ছিটিয়ে বেড়ান তাঁদের কথা বাদই দিচ্ছি! কেননা, বিষয়টা শাস্ত্রের অন্তর্গত। বাদ দিতে হচ্ছে সেই অদ্ভুত প্রথাটির কথাও, যা মানতে গেলে বাড়ীর কচিকাঁচা ছেলেমেয়েসহ কয়েক মিনিট ধরে নিজের দুয়ারে দাঁড়িয়ে নৃত্য নামক সেই কুৎসিত অঙ্গভঙ্গিটি দেখতে হয়। শুধু তাই নয়, নগদে এবং কাপড়ে-চোপড়ে মিলিয়ে বেশ কিছু দিতেও হয়! বলাবাহুল্য, যদিচ শাস্ত্র-নির্দেশিত এবং লোকাচার-অনুমোদিত তবুও এরাও তাদেরই দলে।

ভারতে তথা কলকাতায় সে এক মস্ত দল। বৈচিত্র্যময় ভারতের মতই তাদের নানা সম্প্রদায়, নানা রূপ, নানা বেশ। কখনও হাতে তানপুরা আর খঞ্জনি। কখনও গলায় হারমোনিয়াম, সঙ্গে কোরাসের দল। গান চলেছে দ্বিজেন্দ্রলালী ঢং-এ। সুর: 'যখন সুনীল জলধি হইতে—'। সঙ্গে চলেছে পনের বর্গগজ কাপড় মেলে সেই বহুশ্রুত প্রার্থনা বছরে যা কমপক্ষে পঁচিশবার শুনতেই হয়। এর সঙ্গে যোগ করুন পথে-ঘাটে মাঠে-হাটে প্রতিক্ষণে শোনা সেই কাতর আর্তনাদটি,—'বাবু, একটা পয়সা!' দেখবেন আমরা কোথায় আছি!

গঙ্গার ঘাটে ঘাটে মাছির মত ভন ভন করছে হাজার হাজার প্রার্থী। মন্দিরে, মসজিদে, চিড়িয়াখানার পথে সারি বেঁধে বিলাপে বসেছে আরও কয়েক হাজার। হাজার হাজার হানা দিয়ে বেড়াচ্ছে কখনও পথে, কখনও আপিসে, কখনও বাড়ীর দরজায়, কখনও বা মাত্র এক মিনিটের জন্য থামল যে গাড়িটি তারই জানাল্লায়! তাদের কেউ খঞ্জ, কেউ অন্ধ, কেউ পঙ্গু, কেউ বা দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত। আবার কেউ কেউ এমনও আছে যারা রীতিমত স্বাস্থ্য-সমৃদ্ধ। কিন্তু সকলের মুখেই এক বক্তব্য ঃ 'বাবু! একটা পয়সা!' অথবা, '—মাগো, কিছু খেতে দেবে মা!' কিংবা—'সাহেব, বকশিশ!—সাহেব!—সাহেব!'

এই এক পয়সার প্রার্থীরা সংখ্যায় কত জানেন? সব মিলিয়ে ভারতে নাকি তারা প্রায় দশ লক্ষ!

লজ্জাকর সেই 'জাতীয় তহবিলে' কলকাতার ভাগ কতটুকু স্বভাবতই তা জানতে ইচ্ছে হয়। বোম্বাইয়ে ওঁরা একবার (১৯৫৭) গুনেছিলেন। সে হিসেবে প্রকাশ পেয়েছিল ওখানে ভিখারী নাকি প্রায় দশ হাজার। ১৯৫৯ সনে দিল্লি পরিসংখ্যান নিয়ে জানিয়েছিল —সেখানে ছ'হাজার সাত'শ। কলকাতায় এ ধরনের কোন মাথা-গুনতি হয়েছে বলে শুনিনি! তবে পুলিসের অনুমান ভিখারী এই নগরে সংখ্যায় কমসে কম পনের থেকে কুড়ি হাজার। অথচ, আশ্চর্য এই কলকাতায় কোন ভিক্ষাবৃত্তি-নিরোধক আইন নেই।

১৯৪৩ সনের 'বেঙ্গল ভ্যাগরেন্সি অ্যাক্ট'-এর কোন কোন ধারা-অনুযায়ী কিছু কিছু কাজ চলে বটে, কিন্তু বলা বাহুল্য আইন বাঁকিয়ে এনে সমাজসেবা—সে কোনদিন কলকাতার স্বভাব নয়। বিশেষ, এ বাঁকানোর মানে যেখানে পুলিসের পক্ষে 'ঝঞ্ঝাট' এবং রাষ্ট্রের পক্ষে আরও খরচা।

সুতরাং, পুলিসের সামনেই আজ কলকাতা ভিখারীর রাজত্বে পরিণত হতে চলেছে। সে রাজত্বে তাদের নিজস্ব আইন।

হাজার হাজার ভিখারী। কিন্তু শোনা যায় তাদের প্রত্যেকের জন্যে নির্দিষ্ট করা আছে বসবার, দাঁড়াবার, অথবা হাঁটবার স্থান। মন্দিরের ভিখারী পথে নামবে না, পথের ভিখারী মন্দিরের আঙ্গিনা ছোঁবে না। যার যার চৌহদ্দি নির্দিষ্ট।

ভাবতে পারেন, যেহেতু অশ্রুবর্ষণে সব এলাকা সমান নয়, সেই হেতু নিশ্চয় কোন কোন ভিখারী দিনের পর দিন ঠকে যাচ্ছে। কিন্তু শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, রাজ্যের পরিচালকেরা সে খবরও জানে। এবং জানে বলেই কোন কোন এলাকায় ভিখারী অত্যন্ত বেশী, কোথাও কম।

এরা কারা? গলার স্বর এবং ছন্দ থেকেই বোঝা যায় এরা আমাদের পরমাত্মীয়। অধিকাংশই—বাঙ্গালী। তারপর বিহারী এবং তারপরে ক্রমে দক্ষিণ ভারতীয় এবং অন্যরা। অর্থাৎ জাতিতে সকলে ভারতীয়।

লক্ষ লক্ষ ভারতীয় আজ দ্বারে দ্বারে ভ্রাম্যমাণ ভিক্ষুক কেন সে একটা প্রশ্ন। বলাবাহুল্য, সে প্রশ্নের উত্তর শুধুমাত্র দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দেশবিভাগ কিংবা আর্থিক জীবনে বৈষম্যের সঙ্গে যুক্ত নয়। এর দায় অনেকখানিই এদেশের ইতিহাসের, তথা আমাদের সনাতন চরিত্রের। বলা নিষ্প্রয়োজন—ভিখারী ভারতের প্রায় প্রতিটি ধর্মের স্নেহচ্ছায়ায় লালিত। এবং আমরা যে আজও নির্বিচারে লালন করে চলেছি, সেও প্রধানত ধর্মের নামেই। নয়ত এ ঘটনা কেমন করে সম্ভব হয়?

তথ্য হিসেবে চমকপ্রদ, কিন্তু ঘটনা মিথ্যে নয়।

মানবতাকে কাঁপিয়ে কাতর আর্তনাদ করতে করতে রাস্তা দিয়ে গড়িয়ে চলেছে ঐ যে গলিতপ্রায় মাংসপিণ্ডটি, শুনলে অবাক হয়ে যাবেন সেটি আসলে গলিত নয়। খোঁজখবর নিয়ে দেখা গেছে চিড়িয়াখানার পথে যে মানুষগুলো সর্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে কাতরাচ্ছে তাদের অধিকাংশ অঙ্গই ব্যাণ্ডেজ বাঁধার মত নয়।

কলকাতার ভিখারীদের শতকরা ৮০ থেকে ৮৫ ভাগ পুরুষ এবং বিশেষজ্ঞরা বলেন, তাদের মধ্যে শতকরা ৯ থেকে ১০ ভাগ কর্মক্ষম সমর্থ পুরুষ। উল্লেখযোগ্য, অক্ষম যারা তাদের অধিকাংশও আবার স্বেচ্ছায় অঙ্গহীন!

এমন কি শুনলে অবাক হয়ে যেতে হয় ফুটপাথে ছ'মাসের সন্তানটিকে শুইয়ে বুক অবধি ঘোমটা টেনে হাত পেতে বসে আছেন যে ম্যাডোনা তিনিও নাকি সব সময় সাচ্চা নন।

যুদ্ধের তথা পঞ্চাশের মন্বন্তরের পর থেকে রাজপথে ভিখারিণী বেশে হামেশাই দেখা যাচ্ছে মেয়েদের। ইদানীং সংখ্যায় তারা যথেষ্ট। অন্তত কলকাতায়। এখানে প্রতি একশ ভিক্ষুকে নাকি এখন প্রায় কুড়িজন ভিখারিণী। কোলে ক্রন্দনশীল শিশু নিয়ে দ্বার থেকে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাঁরা। কিন্তু ক'জন ভাবতে পারেন ছ'মাসের শিশুর এই কান্নাটাও সত্য নয়?

ভদ্রলোক ছিলেন চিকিৎসক। সুতরাং, এক হ্যাঁচকা টানে তিনি ব্যাণ্ডেজটা খুলে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে সত্য উদ্ঘাটিত হল। দেখা গেল ছেলেটি ক্ষুধায় কাঁদছে না, কাঁদছে যন্ত্রণায়। ব্যাণ্ডেজের নীচে মা তার একটি পোকা বেঁধে দিয়েছেন। সেটি ক্রমাগত কামড়ে চলেছে, শিশু পরিত্রাহি রবে কাঁদছে।

তবুও কেন এই নিগৃহীতের বৃত্তি? কারণ, ভিক্ষা এদেশে এখনও লোকসানজনক কিছু নয়। বোম্বাইয়ের খবর তাদের রাজ্যে ভিক্ষুকদের মোট দৈনিক আয় দশ হাজার টাকা। অর্থাৎ, বছরে ৩৬ লক্ষ টাকা। বলা বাহুল্য কলকাতায় আরও বেশী।

খবর নিয়ে দেখা গেছে এ শহরে প্রতি ভিক্ষুকের দৈনিক আয় গড়ে আড়াই টাকা ('কমিশন' বাদ দিয়েই)। তবে বিশেষ বিশেষ পরবের দিনে এমনও নাকি হয় যে, একজনের হাতেই পাঁচাত্তর টাকা রোজগার হয়ে যায়। অবশ্য, সে নসিব ভাল থাকলে।

যদি তা মন্দই থাকে তাহলেও হিসেব করে দেখুন একবার মাথাপিছু আড়াই টাকা ধরলে কুড়ি হাজার ভিখারীর দৈনিক আয় কত হয় ?—পঞ্চাশ হাজার !

পঞ্চাশ হাজার আমরা দিচ্ছি, উপায় না করে পঞ্চাশ হাজার ফাঁকি দিচ্ছে ওরা। সুতরাং একমাত্র কলকাতা শহরেই জাতীয় ক্ষতি কি দৈনিক প্রায় এক লক্ষ টাকা নয় ?

প্রশ্ন ঃ কেন এমন হবে ? এ অপচয় কি কিছুতেই বন্ধ করার মত নয় ?

একটি জাতীয় ব্যবসা

মাসে ক'দিন ঠিক বলতে পারব না, মনে হয় রোজই দেখি। প্রত্যহ এবং সর্বত্র। কখনও বৌবাজারের গলির মুখে, কখনও ছুটির দিনে বাজারের পথে চার্চটার সামনে, কখনও খেলার মাঠ থেকে ফেরার পথে চৌরঙ্গীতে, কখনও আফিসের ট্রামে,—কখনও বা আরও কাছাকাছি—টেবিলের ওপারে একমাত্র নিজেরই সামনে।

ওঁরা বহুরূপী। কখনও ওঁরা সামনে এসে দাঁড়ায় শুদ্ধ বেদমন্ত্র মুখে নিয়ে, মাথায় জটার বৌদ্ধ স্তূপ সাজিয়ে চোখে নির্লিপ্ত ধ্যানীর ভাব নিয়ে—সন্ন্যাসীর বেশে, কখনও অসুস্থ অঙ্গটাকে পতাকার মত নাড়াতে নাড়াতে জীবন্ত বিভীষিকা রূপে, কখনও মালিকের হৃদয়হীনতার প্রমাণস্বরূপ কিছু প্রাচীন কাগজপত্রসহ বেকার গৃহকর্তার ভঙ্গী নিয়ে, কখনও কণ্ঠে উপবীত, হাতে কুশাসন এবং মুখে খাঁটি আর্য সন্তানের পিতৃকৃত্য সম্পাদনের প্রতিজ্ঞা মেখে অনাথের বেশে, কখনও আগামী কোন রাজনৈতিক কর্তব্যের আহ্বানস্বরূপ কৌটা ঝাঁকতে ঝাঁকতে ট্রামের সীট থেকে সীটে, কখনও বা কিছু না বলে বুকে একটা 'ইউ ক্যানট এলাউ দি পূওর স্টার্ভ' বা 'ইট ইজ় বেটার টু গিভ দ্যান টু রিসিভ' গোছের কিছু ঝুলিয়ে মুখে পরীদের হাসি মেখে ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুদ্ধ যেন স্বর্গীয় কোন আনন্দসভার 'পাশ' বিলি করতেই।

বক্তব্য ওঁদের সকলেরই এক। অন্তত শ্রোতাদের কানে। কেননা, মুখের ভাষা যাই হক, সকলেরই শেষ কথা ক'টি নয়া পয়সা। তবুও এবার বিশেষ করে তাঁদের কথাই বলব যাঁরা শত শত বছরের চেষ্টায়, বুদ্ধি-বিবেচনা এবং গবেষণায় এই চিরকালের চাওয়াটাকেই প্রায় না-চাওয়ার পর্যায়ে এনে তুলেছেন এবং দিনের শেষে তবুও কৌটোটি ভর্তি করেই ঘরে ফিরছেন!

অপরাধ নেবেন না,—ওঁরা 'ভিখারী' নন, ওঁরা আমাদেরই চ্যারিটি-ওয়ালা!

হাতে সাদা কাগজ আর লাল হরফে মোড়া সুন্দর একখানা কৌটো, বুকে—ঝুলন্ত হাল্কা একখানা ট্রে, তাতে রাশি রাশি ছোট ছোট পতাকা। চোখে মুখে হাসি ছড়িয়ে হাত বাড়িয়ে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। ভিখারী বলে ভাবা যায় না ওঁকে। ভাবলে নিজেকেই ছোট মনে হয়, লজ্জা লাগে।—সন্দেহ নেই পতাকাটা মেয়েটি নিজের হাতেই পরিয়ে দেবে!

সুতরাং, নিজের অজ্ঞাতেই এগিয়ে যাই আমরা। কখনও অফিসের পথে জামাটি যখন সত্যিই পরিচ্ছন্ন সেই মুহূর্তে, কখনও ফেরার পথে সন্ধ্যায় কোন অভিজাত পল্লীতে, কখনও সিনেমায় ঢোকবার মুখে।—ক'টা নয়া পয়সার মামলা বৈ ত নয়! সুতরাং, অবিশ্বাসের প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া শুনে শুনে চিরকালের বিশ্বাস,—বিশ্বাস করে ঠকাও ভাল। (কেন ভাল?)

আমরা তাই কৌটোর গায়ে কি লেখা আছে ভাল করে তা পড়ি না, নিশানটায় কি রং সেদিকে ভাল করে তাকাই না,—সোজা গিয়ে সামনে দাঁড়াই, পয়সাটা বের করি, কৌটোয় ফেলি এবং নিশানটা বুকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেই আবার পথ চলি। এবার সগর্বে যেন।

গর্বের প্রথম কারণ—আমি আর পাঁচ জনের মত নই, আমি অন্যদেরও দিতে জানি। দ্বিতীয়ত, অতঃপর আমার পথ চলায় কোন ভাবনা নেই। এ নিশান বুকে আছে যতক্ষণ ততক্ষণ নিশ্চয় অন্য কোন প্রার্থী এসে বিরক্ত করবে না আমাকে। তৃতীয়ত—আঃ, পতাকাটা কি সুন্দর!—নিশ্চয় দিব্য মানিয়েছে আমাকে!

ওঁরা জানেন আপনি মনে মনে এই কথাগুলো ভাববেন। সমাজে আছে এবং 'নেই'-দের অস্তিত্ব স্পষ্ট হওয়ার দিন থেকেই

মানুষ তা ভাবছে। এবং মানুষ তা ভাবে বলেইনা—পতাকা আজও বিকোয়, বিকচ্ছে!

কিন্তু যদি আপনি আর পাঁচ জনের মত না হতেন, যদি আপনার 'হৃদয়' না থাকত তাহলে? তাহলে আপনি হয়ত একটু চেষ্টা করলেই জানতে পারতেন—সেই বিশেষ দিনটিতে পার্ক স্ট্রীটে কারও পতাকা-বিক্রির কথা ছিল না। কেননা, 'রেডক্রস' তা জানে না। অথচ নিয়ম এই, তাদের অনুমতি ছাড়া কারও 'পতাকা দিবস' অনুষ্ঠিত হতে পারে না। তদুপরি, আপনি যদি আরও একটু জটিল মানুষ হতেন তাহলে দেখতে পেতেন কৌটোর গায়ে যাদের নাম লেখা সমাজসেবা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কোন ডাইরেক্টরীতে তার কোন উল্লেখ নেই। অথচ, সে বাবদেও একটা নিয়ম এদেশে প্রচলিত আছে। সর্বশেষ, আপনি যদি সত্যিই 'হীন মনের' মানুষ হতেন এবং ঐ ফুটফুটে মেয়েটির সঙ্গে পয়সা বের করতে করতে মিনিট কয় আলোচনা করতেন তাহলে জানতে পারতেন সে দেবদূতগণ প্রেরিত কোন স্বর্গীয় পরী নয়, বেচারী মৃত্তিকারই কন্যা, দুটো পয়সা পাবে বলেই অন্যদের জন্যে পয়সা কুড়াচ্ছে!—হ্যাঁ, তাই। অন্তত 'রেডক্রস', কলকাতা পুলিস এবং আমাদের তাই অভিমত!

'ওল্ড টেস্টামেণ্ট' বলেছে—'দি পূওর স্যাল নট সিজ আউট অব দি ল্যাণ্ড', নিউ টেস্টামেণ্ট শুধরে লিখেছে—'ফর দি পূওর অলওয়েজ ই বি উইথ ইউ।' সুতরাং, সাম্প্রতিক এক হিসেবে জানা গেছে ব্রিটেনে নানাভাবে জনতা বছরে দান করে প্রায় দশ কোটি পাউণ্ড। শোনা যায়, 'বিগ বিজনেস'-এর সারিতে আমেরিকায় 'ফিলানথ্রপি'র স্থান সপ্তম। আমাদের এই উপমহাদেশও বলা নিষ্প্রয়োজন কোন অধর্মের রাজ্য নয়। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ-জৈন এখানে প্রতি ধর্মেই দানের জয়গান। ফলে, জগতে দানের ক্ষেত্রে কোথায় আমরা আছি তার সঠিক হিসেব না জানলেও

বিষয়টা বোধহয় অনুমান করা কষ্টকর নয়। কেননা, হিসেবে শোনা গেছে একমাত্র এই কলকাতাতেই ভিক্ষুক আছে চল্লিশ হাজার, এবং শুধু সেবারের কুম্ভমেলাতেই সাধু সমবেত হয়েছিলেন ষাট হাজার। তদুপরি শুনবার মত খবর—একমাত্র বোম্বাইতেই ১৯৫৪ সালের ২১শে জানুয়ারী 'ট্রাস্ট' ছিল ৪৮,৩৩৬টি। তাদের অনেক-গুলোরই সঙ্কল্প শুধু 'দরিদ্রনারায়ণ ভোজন'। যে বছর রেশনের কড়াকড়ি হল সেবার ওঁরা খাওয়াতে পারেননি। সুতরাং, পরের বছর দ্বিগুণ খাওয়া হয়েছিল। আর একবার, তিন বছরের জমানো খাবার খাওয়ার মত লোক ছিল না বলে বিস্তর খাবার নাকি নষ্ট হয়েছিল।

সুতরাং, এহেন দেশে মানুষের স্বাভাবিক সহানুভূতির সুযোগ নেওয়ার মত কিছু লোক যে থাকবে তাতে বিস্ময় কি?—বিস্ময়কর শুধু ওঁদের পদ্ধতিগুলোই।

সেই কৌটোর কথাটাই আগে বলি। প্রতিদিন যে কৌটো-গুলো চোখে পড়ে আপনাদের—লক্ষ্য করলেই দেখবেন সব তার একরকম নয়। উদ্দেশ্য এবং ব্যবস্থায়—সব দিক থেকেই জাত তাদের আলাদা, ভিন্ন। কতকগুলো কৌটো আছে যেগুলো দেখলেই চেনা যায়; বোঝা যায় তাঁরা কে কিংবা কি তাঁদের উদ্দেশ্য। যথা···রেডক্রস, আর্মি-ডে, কিংবা এম্বুলেন্স দিবসে যেগুলো পথে নামে সেগুলো। ওঁরা—সর্বজ্ঞাত; চ্যারিটির ক্ষেত্রে সনাতন। সুতরাং, তাঁদের সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে না।

কিন্তু বাকীগুলো?—মনে করে দেখবেন অনেকের সঙ্গেই আমাদের কোন পরিচয় নেই।

পার্ক সার্কাসের মোড়ে হঠাৎ চলন্ত ট্রামে লাফিয়ে উঠল যে লোক দুটি এবং দু'জনে মিলে প্রায় পঁয়তাল্লিশ নয়া পয়সা কেড়ে নিয়ে চলন্ত ট্রাম থেকে নেমে গেল যাঁরা—তাঁদের কি আপনি চেনেন? হয়ত, লেখা ছিল কামারহাটির কোন এক শ্রমিক-ধর্মঘটে

অর্থাভাবের সংবাদ—কিন্তু সত্যিই সেখানে ধর্মঘট এখনও চলছে কিনা সে খবর কি আপনি নিয়েছেন ?

গাড়ী থামা মাত্র—মাকালীর একটি পোর্টেবল প্রতিমা তেলে-সিঁদুরে সাজিয়ে যে সাধু ওমুক স্টেশন থেকে মাত্র দু'মাইল দূরে স্বপ্নাদিষ্ট যে মন্দিরের ছাদ তৈরীর জন্যে আপনার সামনে হাত মেলে দাঁড়িয়েছেন তিনি কি সত্যিই কোন স্বপ্নের পেছনে অথবা আপনার আমারই মত রূঢ় বাস্তবপন্থী—পকেটে হাত দেওয়ার আগে সে কথা ভাবছেন কি ? ভেবেছেন কি—যে পিতৃহারা বালকটি পিতার শেষকৃত্যের জন্যে আপনার সামনে হাত পেতে দাঁড়িয়ে তারই বাবা এই মুহূর্তে রাস্তার ওপারে একটা আপিসঘরে মেডিকেল কলেজ থেকে জোগাড়-করা একটা ছেঁড়া এক্স-রে রিপোর্ট নিয়ে আদায়ের ফিকিরে থাকতে পারেন, আছেন।

ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ। স্বভাবতই সবচেয়ে সফল এখানে কমণ্ডলুধারিগণ। আশ্রম, মন্দির, যজ্ঞ, কিংবা শুধুমাত্র নিজ উদর —যা নিয়েই সামনে এসে দাঁড়ান না কেন তাঁরা—তাঁদের খালি হাতে ফিরবার সম্ভাবনা নেই! বলা নিষ্প্রয়োজন, সে কারণেই এদেশে মায় সর্বজনীন কার্তিকপূজোর আয়োজনগুলোও কখনও মার গিয়েছে বলে শোনা যায় না।

কিন্তু অন্যান্য দেশে পরিস্থিতিটা একটু ভিন্ন। ব্রিটেনে ওরা পরখ করে দেখেছেন—কুষ্ঠরোগীর জন্যে হাত বাড়ালে যা পাওয়া যায়, সৈনিকদের জন্যে চাইলে তার চেয়ে বেশী মিলে। আবার সৈন্যদের চেয়েও বেশী পাওয়া যায় আবেদনে কুকুরের কথা থাকলে। তার চেয়েও বেশী—শিশুবিষয়ক কিছু হলে। এজন্যে একজন চ্যারিটি-বিশেষজ্ঞ নাকি একবার বলেছিলেন—'অন্ধ শিশুদের জন্যে বেড়ালছানা কেনা হবে' এই মর্মে আবেদন নিয়ে যদি কেউ আসরে নামতে পারেন তবে তিনি বাজীমাৎ করবেন।

দ্বিতীয় পরামর্শ: শুধু বুদ্ধিমানের মত চাওয়ার উপলক্ষ্যটা

নির্বাচন করলেই চলবে না,—চাইবার কৌশলটাকেও মনস্তত্ত্ববিদদের দিয়ে পরখ করিয়ে নিতে হবে। তাহলে দেখা যাবে, যাঁরা দেন তাঁরা সবাই প্রতিদানে কিছু পেলে খুশী হন। সুতরাং, যেখানে সম্ভব সেখানে বুকে একটা নিশান পুঁতে দাও, যেখানে অসুবিধে নেই সেখানে হাতে একটা রসিদ কিংবা কিছু নয় শুধু ছাপা হরফে 'থ্যাঙ্ক-ইউ' লেখা টুকরো গুঁজে দাও অথবা একটা লটারী লাগাও, নয়ত—কোনমতে একটা ফিল্ম শো! খরচ কিছু হবে বটে, কিন্তু আখেরে তাতে লোকসান হবে না।

হিসেব করে দেখা গেছে—তাতে কোন ক্ষেত্রেই খরচ টাকায় এক আনার বেশী হবে না। তার চেয়েও কমে হবে যদি তেমন একটি নামের তালিকা করে ডাকযোগে এগোন যায়। যদি শতকরা দশজন সাড়া দেন তাহলেও অঢেল রোজগার। তবে সমস্ত ব্যাপারটা করা চাই—সময়মত। অর্থাৎ, যেদিন রেডক্রসের পতাকা দিবস সেদিন অথবা সেই সপ্তাহেই ভবিষ্যৎ কোন পিঁজরাপোলের জন্যে নিশান নিয়ে পথে নামলে—হয়ত খরচই পোষাবে না। কিংবা কলকাতায় যখন প্রবল বর্ষণ তখন যদি কেউ আসামের কোন প্লাবনের নামে চাঁদার খাতা নিয়ে বাড়ী বাড়ী হানা দেন তবে বিশেষ সুবিধে হবে না, অথবা—গোয়া নিয়ে যখন গোটা দেশ উত্তেজিত তখন যদি কেউ গোয়াবাগানে নাইটস্কুল স্থাপনের জন্যে কানের গোড়ায় কৌটো ঝাঁকি দেন তবে নিশ্চয় সে শব্দ অনেকেরই মরমে পশিবে না! সুতরাং, পরামর্শ চাইবার দল, প্রগতিশীল হও,—আধুনিক হও!

মনে হয় আজ আমরা তাই হয়েছি। বর্ষায় বন্যাত্রাণ, খরায় দুর্ভিক্ষ-প্রতিরোধ, বেকারের জন্যে—পঞ্চাশ টাকা জামিনের বিনিময়ে দেড়শ' টাকা মাইনের চাকরি, গৃহহীনের জন্যে—ফ্রেণ্ডস কলোনীর স্কীম, উদ্বাস্তুর জন্যে—রিফিউজি ফাণ্ড, কিছু সমাজসেবার নামে, কিছু ধর্মের নামে, কিছু আণবিক বোমা নেভানোর জন্যে জল-খরচা

বাবদে—আমাদের পথে পথেও কৌটো আজ রকমারী। যে সময়ে মনে মনে যেদিকে দুর্বল ঠিক সেই সময়ে তেমনটি!

সুতরাং এবার বোধহয় সময় হয়েছে শুধু পুলিসের অনুমতি নয়, আদায়ের পরে খাতাগুলোও একটু নাড়িয়ে-চাড়িয়ে দেখবার। পশ্চিমে ওঁরা তাই দেখছেন। ভারতেরও কোন কোন রাজ্যে চলতি আইনের সঙ্গে চ্যারিটির ব্যয়ধারা মিলিয়ে দেখা হয়েছে, হচ্ছে। এমতাবস্থায় কোন কারণ নেই কলকাতার নয়া পয়সাগুলো এভাবে জলে ফেলবার।—পয়সা কি আমাদের এতই সস্তা?

পৌরবিজ্ঞান প্রবেশিকা

গ্রীকদের সিটি স্টেট থেকে আজকের মিউনিসিপ্যাল শহর,—নাগরিকের সৌভাগ্য ও দায়িত্ব সব যুগে সমান ছিল না। আজও বোধ হয় সব শহরে সমান নয়। লোকে বলে পিকিংএ মাছি নেই, আমাদের এখানে মশামাছি তুই-ই আছে। টোকিওতে পানীয় জলের অভাব নেই, আমাদের এখানে বাসন-মাজার জলেরও অভাব। লণ্ডনে বসন্ত নেই, আমাদের এখানে কলেরা বসন্ত তুই-ই আছে। এবং ইত্যাদি ইত্যাদি।

যেমন নগরে নগরে, তেমনি নাগরিকে নাগরিকে। আজকের কলকাতার সঙ্গে যেমন তুনিয়ার আর কোন শহরের মিল খুঁজে পাওয়া যায় না, তেমনি এ নগরের মিস্টার সিটিজেনকেও খুঁজে পাওয়া যায় না অন্য কোন শহরে। কেননা, কলকাতার তিনি নিজস্ব রচনা। তাঁর চালচলন সব নগরের নিজের কানুনে বাঁধা।

কলকাতার নিজের হাতে-লেখা সেই বিচিত্র আচারবিধি এক বিস্ময়কর 'পৌরবিজ্ঞান'। যেমনি মস্ত, তেমনি শক্ত। অথচ কলকাতার মনের মত নাগরিক হতে হলে আদ্যোপান্ত তা রপ্ত করা চাই। বলা বাহুল্য, এক জীবনে সকলের পক্ষে তা সহজ নয়, সম্ভবও নয়। সুতরাং নাগরিকদের সুবিধার্থে এ ক্যারিকুলাম সেভাবেই তৈরী হল। যাঁর যতটুকু ক্ষমতা আপাতত সেটুকুই তিনি শিখে নিন। বাকীটুকু না হয় পরেই হবে। ভবিষ্যৎ নাগরিকরা শিখবে। সত্যি সত্যিই এক হাত থেকে পরবর্তী হাতে, এক পুরুষ থেকে পরবর্তী পুরুষে দিয়ে যাওয়ার মতই বিদ্যা এটি।

প্রথমে হাতেখড়ি পর্ব। কলকাতায় যারা তু' বছর কি আড়াই বছর আগে ভূমিষ্ঠ হয়েছেন এবং সবেমাত্র যাঁরা কোন মফঃস্বল শহর

থেকে মহানগরীতে এসেছেন কিংবা যাঁরা আসবেন-আসবেন করছেন, তাঁরা সকলেই এই ক্লাসে বসে যেতে পারেন।

হাতেখড়ি পর্ব তথা বাল্যশিক্ষার দুই ভাগ। এক—থিওরিটিক্যাল, অন্য প্রাকটিক্যাল। থিয়োরি হিসেবে প্রথমেই জেনে রাখবেন—আপনি কলকাতায় আছেন। কলকাতা একদা ভারতের রাজধানী ছিল, এখন পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী। শহর হিসেবে ভারতে তার স্থান (বোম্বাই যত গলাবাজিই করুক) প্রথম, এশিয়ায় কমপক্ষে—দ্বিতীয় এবং বিশ্বে—অষ্টম। আরও জানবেন, সবই আছে সত্য, কিন্তু প্রকৃতার্থে এখানে সেই আসল জিনিসটাই নেই। অর্থাৎ, কোন অভিভাবক নেই। 'পিতা' কেন, খুড়ো জ্যাঠা, পিসি মাসি—কেউ নেই। ঘরেও নেই, বাইরেও নেই। সুতরাং এখানে অনায়াসে আপনি যা যা করতে পারেন তা হচ্ছে:

(১) দোতলা কিংবা তিনতলার জানলা দিয়ে কমপক্ষে থুথু ফেলা। ভয়ের কিছু নেই। চলমান ঐ বৃদ্ধের মাথা সই করে ফেলুন। মিস হলে লজ্জার কিছু নেই। প্রথম প্রথম ঠোঁট ত একটু কাঁপবেই। নিরুৎসাহ হবেন না। 'উৎসাহে কি না হয়, কি না হয় চেষ্টায়?' দিনভর চেষ্টা করে যান। কখনও না কখনও নিশ্চয় সফল হবেন।—পড়েছে ত? এবার হি হি করে হাসতে হাসতে জানলা থেকে সরে যান। নীচে সদর বন্ধ আছে। ভয়ের কিছু নেই। ঘরে ত নেই-ই। কেননা, আপনি যখন আরও ছোট ছিলেন তখন আপনার মা আপনার নিত্যকর্মের ফলটুকু কাগজে মুড়ে প্রতিদিন জানলা দিয়ে এইভাবেই ছুঁড়ে এসেছেন, আপনি তা দেখেছেন। লক্ষ্য করলে দেখবেন এখনও তিনি যাবতীয় নিক্ষেপযোগ্য জঞ্জাল এই পথেই দূর করে থাকেন। সুতরাং, জানলায় আরও একবার উঁকি দিন। এবং সেই কুজনরত (এই বয়সে কলকাতার গালাগালি নাকি তাই শোনায়) লোকটির দিকে তাকিয়ে আর একদফা হি হি করে হাসুন!

(২) দ্বিতীয়ত, এই বয়সে ছাদে ফুটবল খেলা, ছুঁচোবাজী পোড়ান কিংবা ছোট ছোট ইষ্টক খণ্ড সহযোগে অন্যের বাড়ীর জানলা লক্ষ্য করে হাতের টিপ ঠিক করার অভ্যেস করতে পারলে খুব ভাল।

(৩) বাড়ীর সামনে যদি খোলা নর্দমা থাকে, তবে প্রতিদিন ভোরে বা বিকালে বাচ্চাদের দিয়ে তার সদ্ব্যবহার করান সঙ্গত।

(৪) পার্ক থেকে নিয়মিতভাবে ফুল আনিয়ে বাচ্চাদের ঐ বয়সেই জানিয়ে দেওয়া কর্তব্য যে,—পার্কের ফুলগুলো আসলে কারও নয়।

(৫) সর্বশেষ, প্রত্যেক বাচ্চাকে চোখ বুঁজে এক দৌড়ে রাস্তা পার হওয়ার অবাধ সুযোগ দিতে হবে কেননা, নয়ত ছেলেরা ঘরকুনো হয়ে যাবে!

মোটামুটিভাবে এগুলো শেখা হয়ে গেলেই বাল্যশিক্ষা পর্ব সমাপ্ত। শিশু নাগরিক এবার অনায়াসেই রাস্তায় নামতে পারে। এখন সে হাই-স্কুলের ছাত্র। সুতরাং, এবার থেকে সে যা যা করবে তা হচ্ছে ঃ

(১) যখনকার যা খেলা প্রত্যেক সীজনে পাড়ার গলিটিতে সে তা খেলবে। এবং কোন সময় ঠিক না রেখে। তার পায়ের বা হাতের টিপ কেমন হয়েছে এ খেলায় তার পরীক্ষা হবে। যদি সে এখান থেকে এক লাথিতে বলটিকে ঐ থার্ড বাড়ীটার জানলা দিয়ে গলিয়ে দিতে পারে, তবে তাকে 'সাবাস' দেওয়া হবে। যদি সে কাদামাখা বলটিকে এবার ধোপদুরস্ত জামা পরে ঐ যে হন হন করে আপিসে যাচ্ছে লোকটি ঠিক তার পিঠে ফেলতে পারে, তবে তাকে শুধু 'সাবাস'ই দেওয়া হবে না, অগৌণে পাড়ার ক্লাবের লাইফ মেম্বার করে নেওয়া হবে।

(২) এবার থেকে এই গলিতে ট্রাফিক-নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে সে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে।

(৩) অন্যের বাড়ীর দেওয়ালে যা-তা ছবি আঁকবে এবং বয়সে বাচ্চা আছে এই বোধসহ যেখানে-সেখানে বসে নিত্যকর্ম সারবে। এবং দরকার হলে দাদাদের পরামর্শ-অনুযায়ী স্রেফ মজা দেখার জন্যে ইলেকট্রিক তার কেটে দিয়ে যুগপৎ পাড়া এবং কোম্পানিকে নাজেহাল করবে। (কোন কোন পাড়ায়, মাঝে মাঝে তাও হয়)

উপরোক্ত বিষয়ে যদি কেউ যথেষ্ট উৎসাহ প্রদর্শন করে তবে কলকাতার রীতি-অনুযায়ী তাকে পুরো নাগরিক করে নেওয়া হবে। তবে, কর্পোরেশনের ভোটাধিকার পেতে আরও একটু দেরী হবে। কেননা, তার আগে অন্ততঃ স্কুল-ফাইন্যাল পাস করতে হবে, নয়ত নিজের নামে বাড়ীভাড়ার রসিদ দেখাতে হবে, কিংবা নিজেই এক-আধখানা বাড়ী করে ফেলতে হবে। আপাতত যখন সে সম্ভাবনা কম, তখন 'ফ্রি সিটিজেনসিপ'-ই ভাল। এর চেয়ে লোভনীয় জীবন কলকাতায় আর হয় না। কর্তব্য ঃ

(১) গলিতে শুধু খেলাধূলা নয়, সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডেরও দায়িত্ব নিতে হবে। কার্তিকপূজা লক্ষ্মীপূজা থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি আইটেমে পাড়ার মান রক্ষা করতে হবে। দরকার হলে গলির দুই মুখ বন্ধ করে সকাল এগারটা থেকে পরের দিন সকাল আটটা অবধি 'অহোরাত্র' কীর্তন, জলসা বা অন্যেতর কোন আসরের আয়োজন করা যাবে। স্থানীয় বাসিন্দাদের যাতায়াতের জন্যে টিকিটের ব্যবস্থা করলেই চলবে। দমকল, পুলিস-ভ্যান বা অ্যাম্বুলেন্স একান্তই যদি আসতে চায়, তবে হেলিকপ্টারে আসুক। তাই বলে কি—

(এভাবে গলি বন্ধ করে কালচার-রক্ষার উদ্যম কলকাতায় যেন ক্রমেই বেড়ে উঠছে)

(২) দিনরাত্তির অন্যের বাড়ীর রোয়াকে বসে থাকলে খুবই সঙ্গত কাজ হবে। কিন্তু তেমতাবস্থায় চোখের সামনে কর্পোরেশনের

কলটি গলা ছেড়ে বাজে খরচ করে যাচ্ছে দেখে একটু ন্যাকড়া নিয়ে এগিয়ে গেল খুবই অসঙ্গত কাজ হবে।

(৩) মাঝে মাঝে সোডার বোতল, বোমা কিংবা এ্যাসিড বালব যোগে নিজেদের অস্তিত্ব জাহির করতে হবে। পুলিস এলে কড়া গলায় জানিয়ে দিতে হবে—এসব পাড়ার ব্যাপার!

'ফ্রি সিটিজেন' যতক্ষণ সম্ভব পাড়ার মধ্যেই থাকবেন। বাইরে গেলে অবশ্যই দলবদ্ধভাবে। তখন যা যা করা যাবে:

(ক) স্টপেজের একটু আগে বা পরে দাঁড়িয়ে থেকে সাঁ করে ট্রামটায় বা বাসটায় উঠে যেতে হবে। (খ) হাত ফস্কে পড়ে গেলে বন্ধুদের ডেকে তৎক্ষণাৎ ড্রাইভারটিকে মেরে ফেলতে হবে। যদি তা না পারা যায়, তবে গাড়িটি অন্তত তৎক্ষণাৎ পুড়িয়ে ফেলতে হবে। (গ) (নিজে) বেঁচে থাকলে ট্রামের বা বাসের হাতলটি ধরে ঠিক ওখানটায়ই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। (ঘ) নেহাৎ বসে যাওয়ার বাসনা হলে দশটা লোক ডিঙ্গিয়ে আগের ঐ সীটখানাই ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে বসতে হবে। (ঙ) এবং বসেই হয় (দেওয়ালের ঐ 'প্লীজ ডু নট ইনসিস্ট অন হাইয়ার স্পীড' নোটিশটার ওপর চোখ রেখে) ড্রাইভারকে 'জোরসে, আউর-জোরসে' হুকুম দিতে হবে, নয়ত পাশের লোকের খবরের কাগজটার দিকে হাত বাড়িয়ে বলতে হবে—দাদা, দেখি আপনার কাগজটা! কাগজ পড়তে পড়তে (মানে, কোন হলে কি হচ্ছে, তা আর একদফা ঝালাই করে নিতে নিতে) এ সময়ে অনায়াসে (চ) নস্যের কৌটো বের করে কিছু নাকে দেওয়া চলবে। (দু' চারজনের চোখে জল আসবে, কিন্তু সে আপনার কি!) কিংবা (ছ) বাল্যের সেই অভ্যাস-অনুযায়ী দোতলা বাসের কিংবা একতলারই সামনের সীটের সন্নিকটবর্তী জানালা দিয়ে নাক ঝাড়া চলবে! কেউ কিছু বললে—যদি অনুগ্রহ করে 'অঃ—সরি!' বলেন, দেখবেন, তা-ই যথেষ্ট বিবেচিত হচ্ছে।

কোথায় যাচ্ছেন? সিনেমা?—মাঠ?—পার্ক? যেখানেই যান, খবরদার (ক) কক্ষনো লাইনে দাঁড়াবেন না। কলকাতায় কোন লাইন কোনদিন স্ট্রেইট লাইন হয় না। 'সুতরাং এলবো ইওর ওয়ে'। এতে লজ্জা নেই। বরং—পুরুষত্ব আছে। (খ) পার্কে গেলে বেঞ্চিতে না বসে সটান শুয়ে পড়ুন কিংবা পেছনের রেলিংটার ওপরে বসে স্ট্যাচুর কায়দায় পা দুটো বেঞ্চিটার ওপরে রাখুন। তাড়াতাড়ি নজরে পড়ার এরচেয়ে ভাল পজিশন আর হয় না। (গ) ছোটবেলায় পার্কে ফুল তুলেছেন। এখন সময়টা যদি নেহাৎ অসময় হয়, তবে—বৃহত্তর কিছু করুন। অন্য কিছু খুঁজুন। রেলিং, মারকারি বালব......

(প্রমাণ ঃ টালা পার্ক। প্রমাণ ঃ দেশপ্রিয় পার্ক। লোহা যে মূল্যবান তার প্রমাণ—যে কোন পার্ক।)

এবার পাকা নাগরিকদের কথা।

ডিগ্রি কোর্স যাঁরা শেষ করেছেন, সেই সব গৃহস্থদের কথা। বলতে গেলে আপনারাই এ শহরের সব, সেইহেতু আপনাদের কর্তব্য নিম্নলিখিত অনুশাসনগুলো কায়মনোবাক্যে মেনে চলা।

(১) উনুনটি ধরিয়ে এক দৌড়ে বাইরে (মানে, অন্যের উঠোনে) রেখে এসে নিজের দরজায় খিল দিন। এ ধোঁয়া নিজেদের পক্ষে উপকারী নয়।

(২) পাশের বাড়ীতে রোগী কিংবা পরীক্ষার্থী আছে? তবে রেডিওটাকে আর একটু চড়িয়ে দিন। সঙ্গে মেয়ে এবং ছেলে দুটোকে গলা মিলিয়ে একটু গাইতে বলুন।—'অলওয়েভ' রেডিও যখন তখন বন্ধ করছেন কেন। বোতাম ঘুরান, দেখবেন কোথায়ও না কোথায়ও কিছু না কিছু হচ্ছেই। তাই বা মন্দ কি!

(৩) রেডিওর অভাবে, পটকা বোমা, শুধু গলায় যুৎসই বোম্বাইগান, অহোরাত্র কীর্তন কিংবা নিদেনপক্ষে যে কোন উপলক্ষ্যে মাইক্রোফোনও চলতে পারে।

(৪) আপনার আঁস্তাকুড়টি যেন সব সময় অন্যের ঘরের নাক-বরাবর হয়।

(৫) আপনার দোকানটি যেন সব সময় ফুটপাথ জুড়ে হয় (পুলিস কিছু বলবে না : দ্রষ্টব্য ২০।১১।৬০ তারিখের খবরের কাগজের 'আইন আদালত'।)

(৬) আপনার ঝালাই কিংবা সারাইয়ের কারখানাটি যেন সব সময় বসত পাড়ার বা স্কুলের বা হাসপাতালের খুব কাছাকাছি হয়। [কলকাতায় এমনি বেআইনি ফ্যাক্টরীর সংখ্যা কয়েক হাজার]

(৭) আপনার বাড়ী তৈরীর মালমসলাগুলো যেন সব সময় অন্যের বাড়ীর দুয়ারবর্তী বা পাঁচজনের চলার পথের মধ্যবর্তী হয়।

(৮) আপনার যাবতীয় ছোটখাট অভ্যাসগুলো যেন সব সময়ই কোন পাবলিক প্লেসে সমাধা হয়। [দ্রষ্টব্য : হাওড়া ব্রীজের যে কোন কোন একটি স্তম্ভের গোড়া, রাইটার্স বিল্ডিং-এর একটি দেওয়াল কিংবা 'কমিট নো নুইসেন্স' খচিত যে-কোন একটি দেওয়ালের তলদেশ]

ধরে নিচ্ছি, আপনি এগুলো সবই পারেন বা করেন। তবে এবার আপনি কলকাতার মনের মত নাগরিক। আপনার এই অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে পকেটে যদি যথেষ্ট অর্থ থাকে তবে এবার আপনি যা যা পারেন তা হচ্ছে···

(১) যে পাড়ায় পাঁচতলা বাড়ী করার অনুমতি নেই সে পাড়ায় দশতলা বাড়ী তুলতে (কলকাতায় নাকি তাও হচ্ছে)।

(২) বাড়ীর পেছনে দশ ফুট বা পাশে চার ফুট জায়গা কখনো ফাঁকা রাখবেন না। জমির দাম আছে।

(৩) কখনই নিয়মিতভাবে ট্যাক্স দেবেন না। সরকারও তা দেয় না। [কলকাতা কর্পোরেশন অনাদায়ী ট্যাক্সের পরিমাণ লক্ষ লক্ষ টাকা] আপনি বরং পাকিস্তানী কায়দায় ক্রমাগত একটার পর একটা 'অবজেক্সান' তুলে যান।

(৪) এবং সখ থাকলে এবার আপনি দুয়ারে একটি দুগ্ধবতী গাভী প্রতিপালন করতে পারেন। নিদেনপক্ষে, নগরের ষণ্ডকুলে একটি ছোটখাট কনট্রিবিউশান ছেড়ে দিন। তাতেও কাজ হবে। আপনি সুখী হবেন, পরলোকে পূর্বপুরুষেরা তৃপ্ত হবেন, এবং নগর সুখে থাকবে।

তবে হ্যাঁ, সকলেই প্রতিদিন খবরের কাগজ পড়বেন এবং কর্পোরেশনকে নিয়মিতভাবে গালাগালি করবেন।

'—শহর শিখাওয়ে কোতোয়ালী'

বড় রাস্তার ওপরে ছোট্ট একটা পানের দোকান। সামনে একটা মস্ত ভিড়। ভর-তুপুর। রাজপথে এমন সময়ে এমন ভিড় হওয়ার কথা নয়। তবুও হৈ হৈ ব্যাপার। লোকে লোকারণ্য। গাড়ি-ঘোড়া বন্ধ হওয়ার উপক্রম। দূর থেকে হঠাৎ দেখলে মনে হবে বোধহয় কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটে গেছে। অথবা, কোন তুর্ঘটনা।

কিন্তু কাছে গেলেই বুঝতে পারবেন ঘটনাটা মোটেই সে ধরণের মারাত্মক কিছু নয়। পরন্তু উল্টো। মুহূর্তে আপনি বুঝতে পারবেন—এতগুলো লোকের জমায়েত যে বস্তুটিকে কেন্দ্র করে সে একটি নির্দোষ রেডিও সেট। দিনটি শনিবার এবং বেলা এখন পৌণে তুটো। 'অনুরোধের আসর' বসছে রেডিওতে। দোকানটির গা ঘেঁসেই কলকাতার একটি বিখ্যাত কলেজ। কলেজ ভেঙ্গে ছেলেরা তাই এসেছে গান শুনতে। সে এক দৃশ্য। ফুটবল লীগ বা টেস্ট ক্রিকেটের ধারা-বিবরণী শোনার জন্যেও ভিড় হয়। কিন্তু এ ভিড়ের প্রকৃতি সম্পূর্ণ অন্য রকমের। এক পাশে সরে গিয়ে দাঁড়ালে স্পষ্ট শুনতে পাবেন—ফাঁকা ক্লাশে গলা ফাটিয়ে সেনানায়ক হিসাবে আলফ্রেডের মহত্ত্ব বোঝাতে চেষ্টা করছেন বৃদ্ধ অধ্যাপক আর তাঁরই ক'পা দূরে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ভাবগদগদ গলায় রেডিও থেকে গান তুলে নিচ্ছে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র—'চোখের নজর কম হলে আর…কাজল দিয়ে কি হবে…কি হবে!'

জ্ঞানের আঙ্গিনা থেকে গেরস্থের প্রাঙ্গণে আসুন। কলকাতার যে কোন ভদ্রপল্লীতে একটা চক্কর দিন। আরও কয়টি দৃশ্য চোখে পড়বে আপনার।

বেলা এখন ক'টা হবে?—বড়জোর সাতটা! ঘরে ঘরে ব্যস্ত নগর-জীবন। গায়ে তেল মাখতে মাখতে কাগজ পড়ছেন কর্তা।

থেকে থেকে উঠে গিয়ে সন্ধান নিচ্ছেন স্নানের ঘরটা ফাঁকা হল কিনা। রান্নাঘরে ত্রস্ত হাতে পাখা চালিয়ে আপিস-টাইমের ভাত নামবার চেষ্টা করছেন গিন্নি। এক মুহূর্ত সময় নেই কারও হাতে। কিন্তু তাকিয়ে দেখুন গলির মোড়টায়। অন্তত সাত সাতটি ছেলে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। ওরা যেন সবাই ক্যাসাব্ল্যাঙ্কা। কারও নড়বার উপায় নেই। সংসার জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও এক পা নড়তে পারবে না ওরা।

কেন? ভোরে মেয়েরা স্কুলে গেছে। ওদের ফিরে আসা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে না থাকতে পারলে চলবে কেন? ইতিমধ্যে আপিস-যাত্রীদের ফাঁকে ফাঁকে দু'চারটি যাত্রিনীও বের হবেন নিশ্চয়! তাছাড়া কলেজের মেয়েগুলো ত আছে-ই।

আছে মানে—আসছে। বোঁ করে একটা সাইকেল এসে থামল রোয়াকটার সামনে। লাফিয়ে নামল একটি ছেলে। সঙ্গে সঙ্গে ওকে ঘিরে দাঁড়াল অন্য সবাই। কেউ ছোট্ট পকেট-চিরুনিখানাতে মাথাটা একটু ঠিক করে নিল, কেউ চটপট ঘাড়টা একটু ঝাকি দিয়ে জামার কলারটা। ওরা রেডি হয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই আবার লাফ দিয়ে সাইকেলটায় চড়ল বার্তাবহ ছেলেটি। একটু কায়দা করে ওখানটায়ই দুটো পাক দিয়ে বোঁ করে অদৃশ্য হয়ে গেল যেদিক থেকে সে এসেছিল আবার সেই দিকেই।

গাঁয়ের মেয়েরা যেভাবে রেলে বসে দুর্গা নাম জপতে জপতে পদ্মার পুল পার হয় সেভাবেই চক্ষুকর্ণ বন্ধ করে কোন মতে গলির বাঁকটা পেরিয়ে গেল মেয়েগুলো। তাই যেতে হয় প্রতিদিন। এখানে চোখ-খোলা লজ্জাকর। কানপাতা আরও।

'স্ল্যাং' বা একধরণের বিশেষ শব্দযোগে-গঠিত একটি বিশেষ বাচনভঙ্গীর কথা সব দেশেই শোনা যায়। বিশেষ করে—যুদ্ধ ক্ষেত্রে বা পারিপার্শ্বিকহীন অসামাজিক নাবিকদের আড্ডাখানায়। কিয়ংপরিমাণে নগরের অন্ধকার এলাকাগুলোতেও। কিন্তু

কলকাতার মত ভদ্র পল্লীর আনাচে-কানাচে এমন প্রখর বাচনভঙ্গী আর বাক-স্বাধীনতার কথা কোথায়ও শোনা যায় না।

মেয়েদের মত ভদ্র ছেলেদেরও এখানে তাই রুচিতে বাধলে কান বন্ধ করেই চলতে হয়।

কিন্তু তা হলেও যে আপনি যখন-তখন সেখানে চলবার অনুমতি পাবেন তা বলা যায় না।

সরু গলি। বরাবর এখানে সাধারণতঃ ক্রিকেট কিংবা ফুটবল-ই হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, দুই খেলাতেই বেচারা টেনিস বলের প্রাণান্ত। সেদিন জানি কি খেয়াল হল, রোয়াকের কনট্রোল বোর্ড থেকে ঘোষিত হল—আজ ব্যাডমিণ্টন হবে।

হবে মানে, তক্ষুনি হওয়া চাই! সঙ্গে সঙ্গে এবাড়ীর জানলা আর ওবাড়ীর দরজায় ওরফে দুটো দড়ি খাটান হয়ে গেল। দুর্ভাগ্য-বশত জনৈক মোটরারোহীর তখন সেই পথেই গন্তব্য। তিনি তিনি প্রথমে গাড়ির ভেতর থেকেই দড়ির নিষেধাজ্ঞা উত্তোলনের আবেদন পেশ করলেন। কিন্তু খেলোয়াড়দের তা শোনবার অবসর নেই। বাধ্য হয়েই ভদ্রলোককে নামতে হল। বড়দের বড়রা অর্থাৎ দাদাদের দাদারা আবির্ভূত হলেন ব্যাডমিণ্টনের মাঠে।—তা বুড়ো মানুষ আপনার-ই বা আক্কেল কেমন দাদা, আপনার ছেলের বয়সী ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া করছেন! মোটরে যাচ্ছেন তাও একটু ঘুরে যেতে আপত্তি!

ইতিমধ্যেই একটি ছেলে জানালা দিয়ে হাত গলিয়ে দু'এক দফা ভেঁপু বাজিয়ে ফেলেছে। ভদ্রলোক বাধ্য হয়ে আবার গাড়ি ব্যাক করলেন। যেতে যেতে শুনলেন—'ব্যাটাচ্ছেলের গাড়ির লম্বরটা টুকে রাখ দিকি!'

এই হচ্ছে শান্তির সময়ে স্বাভাবিক কলকাতা। এখানে কলেজের ছেলেরা ক্লাস ফাঁকি দিয়ে রেডিওর রম্যগীতি ভাঁজে, পঁচিশ বছরের জোয়ান ছোকরা নিষ্ঠাভরে মেয়েদের স্কুলের বাসের

পেছনে পেছনে রেস-সাইকেল চড়ে ঘুরে বেড়ায়, আট বছরের শিশু বৃদ্ধ পথিকের গাড়ির নম্বর টুকে রাখে। কোলকাতায় এমন কোন ফাঁকা দেওয়াল নেই যেখানে বিকৃত যৌবনের কিছু না কিছু স্বাক্ষর নেই। কলকাতায় এমন কোন গলি কিংবা পার্ক নেই যেখানে অসভ্য দৃষ্টি কিংবা বাক্যের আক্রমণ নেই। এখানে সপরিবারে সাধারণ দোকানে বসে চা খাওয়া বা সিনেমা দেখা সমস্যা বিশেষ। এখানে নির্দ্বিধায় ট্রামে-বাসে চলাফেরা মেয়েদের কাছে শঙ্কা বিশেষ। এ শহরের ছেলেদের রাজনৈতিক চেতনার (!) খুব খ্যাতি। কিন্তু নজর করলেই দেখবেন কোন প্রকৃত রাজনৈতিক সমস্যায় তাদের আগ্রহ খুব কম। খবরের কাগজে চিঠিপত্র কলমে তারা কখনও মুখ খুলতে চায় না, কিন্তু সিনেমা কাগজগুলোতে তারা মুখর।

অবশ্য এই কর্মসূচীতে ব্যতিক্রম হয় কখনও কখনও। কলকাতা তখন উঠে আসে গোটা ভারতে খবরের কাগজের প্রথম পাতায়! ভারতের সবচেয়ে বড় শহরে, পশ্চিমবঙ্গের রাজধানীতে তখন অশান্তি। দিনের পর দিন ট্রাম-বাস অচল থাকে। আপিস-কাছারি বন্ধ। বোমা ফাটে, সোডার বোতলে পাখা গজায়, আগুন জ্বলে, মানুষ মরে। একদল বলেন বিপ্লব হচ্ছে, অন্যদল বলেন—বর্বরতা।

কিন্তু আসলে যা হয় তা বিপ্লবও নয়, নিছক বর্বরতাও বোধহয় নয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যদি কখনও দেখেন সেই কলকাতাকে দেখবেন—খেলা হচ্ছে। গলির সেই ব্যাডমিণ্টন খেলাটিই একটু অন্যভাবে:

গলির মোড়ে রাত দশটায় সিঙ্গা ফুঁকে বিপ্লবের নোটিশ দিয়ে গেল কারা তা কারও জানবার দরকার নেই। এটুকু জানলেই যথেষ্ট—কাল হরতাল। হরতাল মানেই স্কুলে যেতে হবে না, কলেজে যেতে হবে না, এবং স্টেটবাস যদি শেষ পর্যন্ত না-ই চলে তবে আপিসেও না গেলে চলবে!

সুতরাং, কেরানীবাবু বাস-স্টপেজএ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্টেটবাস পোড়ান দেখতে পারেন। দেখতে দেখতে তাঁর কাছে যেমন বাস আর এ্যামবুল্যান্স-এর ফারাক থাকে না তেমনি পোড়াতে পোড়াতে ওদের কাছেও হরিণঘাটার তুধের ঘর আর থানায় বিশেষ পার্থক্য থাকে না।

সে এক মজাদার পোড়াবার খেলা। বন্ধ করার উপায় নেই। কারণ, বরাবরই নিঃশব্দে আপনার দরজার সামনে ওদের খেলতে দিয়ে এসেছেন। আজ খুব অস্বস্তি বোধ করলেও মনের গাড়িটিকে ব্যাক করতে হবে আপনাকে। এখেলা যে শুধু আপনার উঠানের খেলা তাই নয়,—এখেলার শিক্ষকও আপনি।

মনে করলেই দেখতে পাবেন এই বেপরোয়া যৌবন বরাবরই আপনার বাহুবল। ভাড়াটিয়া শাসন থেকে শুরু করে কর্পোরেশনের ইলেকশান, মায় এসেম্বলি কাউন্সিল পর্যন্ত এদের বলে চলে এসেছেন আপনি। অনেক রাজনৈতিক ক্রিয়াকৌশল শিখিয়েছেন এদের তিন-তিনটে ইলেকশনে। তার ওপর পূজোটা, জলসাটা, সংস্কৃতি সম্মেলনটা উপলক্ষেও কম শিখেনি ওরা। সুতরাং, আজ সুযোগ যখন এসেছে তখন ওরা খেলা একটু দেখাবে বইকি! এক পক্ষ থেকে থেকে হাততালি দিয়ে উঠবেন। কেননা, যেন তেন প্রকারণেই নাকি তাঁদের পন্থা। গোলটা শত্রুপক্ষেরা খেলে অন্য পক্ষের হাততালিতে আপত্তি নেই। কেননা, তাঁরাও জেনে গিয়েছেন ভাল ছেলেদের ঘরের জামাই করা যায় বটে, কিন্তু রাজনীতি করতে হলে চাই এই খেলোয়াড়দের।

সুতরাং, এক দিকে পুলিস বাঁধে, অন্য দিকে তদ্বির তোষামোধে পৃষ্ঠপোষকরা বন্ধন ছেদন করেন এবং এই যুগপৎ শাসন-পোষণের ফলে খেলোয়াড়রাও আজ তাই অকুতোভয়। তারা জেনে ফেলেছে মাঠে আজ রেফারী নেই।

রেফারী নেই তার প্রমাণ পাবেন প্রতিদিনের খবরের কাগজের

পাতায়, আইন-আদালতের সংবাদে, নগর কোতোয়ালদের রিপোর্টে। ময়দানে সন্ধ্যারাতে বান্ধবীকে হারিয়ে হাসপাতালে শয্যা নিতে হয় বন্ধুকে। দিন-দুপুরে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে গিয়ে জীবনসঙ্কটে পড়তে হয় ব্যবসায়ীকে। ডাকাত ধরতে গিয়ে প্রাণ দিতে হয় গৃহস্থকে। এবং এমনি আরও কত ঘটনা। সামান্য তর্কতর্কিতে কলকাতা আজ কোমর থেকে ছোরা বের করে। তর্ক একটু আধুনিক ধরণের হলে হাতিয়ারে হাত দেয়। কলকাতা আজ চালচলনে বেপরোয়া।

বলতে পারেন কিছু কিছু সব দেশেই এমনি থাকে। আমরা আরও এক পা এগিয়ে গিয়ে সম্মতি জানাব আপনার কথায়। শুধু সব দেশে নয়, সর্বযুগেই কিছু কিছু মানুষ থাকে যারা সমাজ-বিরোধী। সেই এ্যারিস্টটলের গ্রীস দেশেও তারা ছিল। আজকের নিউইয়র্কেও তারা আছে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সমাজের কোথায় তাদের স্থান? কলকাতার মত প্রতিটি পাড়ায়, প্রতিটি গৃহস্থের দরজায় নিশ্চয় নয়। দ্বিতীয়ত, আমাদের দেখতে হবে—গতকাল তারা যেখানে ছিল আজ তারা সেখানেই আছে কিনা।

অত্যন্ত লজ্জার কথা, গেল ক'বছরে আমাদের সমাজে তাদের আসন অনেক উপরে উঠে এসেছে আজ। সংখ্যাবৃদ্ধির চেয়েও এদের এই মর্যাদাবৃদ্ধিটাই আমাদের পক্ষে লজ্জাকর বেশী।

সমাজে সমাজ-বিরোধী মানুষের সংখ্যা কেন বাড়ে তার কিছু কিছু সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু তাদের যখন সানন্দে স্বীকার করে নিই আমরা তখন তার ব্যাখ্যা একটিই। সেটি—সমাজের নানা অঙ্গে যারা শীর্ষে অধিষ্ঠিত তাদের মেরুদণ্ডহীনতা।

রাজপথে ষণ্ডামি

সাম্প্রতিক দুটো সংবাদ।

এক : কলকাতার একটা বিখ্যাত রাস্তার ফুটপাথে বসে জনৈক পথচারীর ভাগ্য গুনছিলেন এক বৃদ্ধ গণৎকার। তাঁর এক হাতে মক্কেলের করকোষ্ঠী, অন্য হাতে ম্যাগনিফাইং গ্লাস। সামনেই চকখড়িতে আঁকা গ্রহ-পরিস্থিতির মস্ত ছক। ডাইনে এক ফালি রক্তবর্ণ বস্ত্রখণ্ডে জড়িত তদ্বিষয়ক শাস্ত্রীয় রেফারেন্সাদি। বৃদ্ধ গণৎকার মাঝে মাঝে সেগুলো উল্টোচ্ছিলেন, আর চোখ বুজে ভবিষ্যৎ বলছিলেন। তাঁর সামনে বসা একটি মনুষ্যসন্তানের ভবিষ্যৎ। চাকুরিটা হবে কিনা, হলেও পারিবারিক শান্তি ফিরে পাওয়া যাবে কিনা, শীঘ্রই কোন বিপদের আশঙ্কা আছে কিনা, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

শেষোক্ত প্রশ্নের উত্তরটা তখনও শেষ হয়নি, কোন্ শাস্ত্র এ সম্বন্ধে কি বলে তখনও তার জাবরকাটা চলছে, এমন সময় সহসা একটা অশাস্ত্রীয় কাণ্ড ঘটল। স্থানটা 'চায়না-সপ' নয়, জ্যোতিষের দোকান। তবুও উদ্দণ্ডপ্রতাপ এক ষণ্ড এসে হাজির হল! মুহূর্তে তার পদাঘাতে ফুটপাথের ভূত-ভবিষ্যৎ আসর লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। নিরীহ ভবিষ্যত-সন্ধানী তার পদতলে পিষ্ট হলেন, ব্রাহ্মণ শৃঙ্গে আরোহণ করলেন। উপস্থিত তিনি কোথায় কি অবস্থায় আছেন ঈশ্বর জানেন।

দ্বিতীয় খবরটি আরও লোমহর্ষক। রাজপথে কর্তব্য পালন করছিলেন জনৈক রাজপুরুষ। তাঁর দেহে রাজকীয় পোশাক। পায়ে স-পটী বুট, গায়ে সাদা উর্দি, কোমরে তকমা আঁটা বেল্ট, মাথায় মস্ত লাল পাগড়ি, হাতে মসৃণ বেত্রদণ্ড। সুতরাং, চিনতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তবুও কি জানি কি হল, সহসা এক ভীমকায় ষণ্ড বেচারা নগর কোতোয়ালকে আক্রমণ করে

বসল। আকস্মিক আক্রমণ। সুতরাং, বিনা যুদ্ধেই রাষ্ট্রশক্তি পর্যুদস্ত হল। মদগর্বে গর্বিত বীর গড়াতে গড়াতে যথাস্থানে ফিরে গেল। আহত কনস্টেবল প্রথমে হাসপাতালে স্থানান্তরিত হলেন। তারপর সেখান থেকে অন্যত্র।

আজ আর তিনি জীবিত নেই। এবং সর্বশেষ শোনা গেল, তাঁর জনৈক সহকর্মীও তাঁকে অনুসরণ করেছেন।

* * *

পর পর দুটো ঘটনা। ঘটেছে স্পেনের ষাঁড়-লড়াইয়ের আখড়ায় নয়, বিশ্বের প্রথম এগারটি শহরের অন্যতম এই কলকাতার রাজপথে এবং ঘটেছে দ্বাপরযুগে নয় খ্রীষ্টজন্মের পাকা এক হাজার নয় শ' ঊনষাট বছর পরে। সুতরাং ঘটনা দুটো নিঃসন্দেহে স্বমহিমায় আলোচ্য।

সে আলোচনায় নামবার আগে এ নগরের ষণ্ডকুলের বংশাবলীর কিঞ্চিৎ পরিচয় নেওয়া আবশ্যক। প্রথমেই মনে রাখতে হবে, গো-কুলোদ্ভব হলেও কলকাতার ষণ্ডরা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সম্প্রদায়। তাদের রীতিনীতি আলাদা, চাল-চলন আলাদা, জীবন আলাদা।

গাড়োয়ানের ঘরের-লক্ষ্মী পৌরুষহীন ষণ্ডযুগল যখন টন টন কয়লাবোঝাই গাড়ি টানছে কুলীন-কুল-শিরোমণি নাগরিক ধর্মষণ্ড তখন আয়েসে লাইটপোস্টে পিঠ ঘসছে,—আর আড় চোখে মজা দেখছে। তার কোন দায় নেই, দায়িত্বও নেই।

কিন্তু জীবন আছে। লক্ষ্য করলে দেখবেন সংসারও আছে। টিপ টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে। ফুটপাথে দাঁড়িয়েই ষাঁড়টা একবার মাথা উঁচু করে আকাশের দিকে তাকাল। তারপর হঠাৎ ঘুরে রাস্তায় নেমে পড়ল। ভাবখানা এই যেন—এই যাঃ, ছাতাও নিয়ে আসিনি! অথচ এই টিপ টিপ বৃষ্টিতে ভেজাটাও বোধ হয় ঠিক

হবে না। সর্দি হতে পারে। সুতরাং সামনের এই গাড়িবারান্দার দিকেই এগিয়ে চলল সে। সেখানে তখন লোকে লোকারণ্য। কিন্তু তা হক। অরণ্যে সহাবস্থানই ত নিয়ম! সুতরাং, একরাশ মানুষের ভিড়ে অনায়াসে ছুটো গরু একমোডেট হয়ে গেল।

সেই যে ও বাড়ীর গাড়িবারান্দাটি ষণ্ডরাজ চিনল আর কোন দিন তাকে ভুলল না। এখন বলতে গেলে এটাই তার স্থায়ী ঠিকানা। ছুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বাড়ীর মেয়েরা যখন দরজা দিয়ে ঘুমোয় আশেপাশের সমুদয় ষণ্ডরা তখন গাড়িবারান্দায় দল বেঁধে ঝিমোয়। বিকেলে কর্তাদের গাড়ি আসে, হর্ন বাজে। ওরা একটু সরে গাড়িটাকে দাঁড়াতে দেয়। গাড়ি গ্যারেজে ঢুকলে আবার শয্যা নেয়।

সেদিক থেকে আমাদের নাগরিক ষণ্ডরা অধিকাংশই শিক্ষিত, নম্র, বিনয়ী এবং ভদ্র। মেয়েটি ভয়ে পিছুতে পিছুতে নর্দমায় পড়ার উপক্রম। কিন্তু তরুণ ষণ্ড যেন নবীন উদাসী। একবার ফিরেও তাকাল না সেদিকে। আপন মনে সে চলে গেল তার পথে।

চিৎপুরের পথটা সঙ্কীর্ণ হলেও ডাইনে বাঁয়ের লোকগুলোর মন উদার! ষণ্ডকুলের কাছে তাই স্থানটা গোকুলতুল্য। এখানে ভোরে ঘুম ভাঙবার আগে প্রাতরাশ মিলে, ছুপুরে উদরপূর্তি মধ্যাহ্ন ভোজ,—সন্ধ্যায় আবার জলখাবার। তারপর যদি ইচ্ছে হয় এদিক-ওদিক জিভ চালাও। অরহরকা ডাল আছে, ছোলা আছে, পথের পাশে সব্জী ভি আছে। চলতে চলতে যেটা ইচ্ছে তুলে নাও। কেউ কিচ্ছু বলবে না। বড়জোর পিঠে একটা কিল পড়বে, লেজে একটু মোচড়। যার মর্মার্থ: ছুষ্টু ছেলে কাঁহাকা!

অথচ এই চতুষ্পদ ধর্মপুত্তরগুলো কিন্তু খুব ছুষ্ট নয়। ফুটপাথে ভিড়। তাই বাধ্য হয়েই রাস্তা দিয়ে চলছে। পেছনে ট্রামের শব্দ হচ্ছে। তা হক। ও স্পষ্ট বুঝতে পারছে ট্রাম এখনও হ্যারিসন রোডের মোড়ে। সুতরাং, তাড়াহুড়ার কি আছে!

অবশেষে ঘন্টি বাজাতে বাজাতে ট্রাম যখন সত্যিই পেছনে এসে দাঁড়াল তখন আর কাউকে কিছু বলতে হল না। প্রয়োজন বোধ করলে ধীরে ধীরে লাইনটা পার হয়ে উল্টোদিকের ফুটপাথে উঠে গেল, নয়ত একটু সরে গিয়ে গাড়িটাকে চালু করে দিল। চিৎপুরের কণ্ডাক্টরদের তাই ষণ্ডের বিরুদ্ধে বিশেষ কোন নালিশ নেই। তারা বলে,—ওরা পথের আইন ভাঙে বটে, কিন্তু আইনটা কি তাও বিলক্ষণ জানে!

তবুও যে মাঝে মাঝে হৈ হট্টগোল লেগে যায় সেটা ওদের শিক্ষার দোষ নয়, বিশেষ বিশেষ কোন কোনটার স্বভাবের দোষ।

*　　　*　　　*

ওয়েলিংটনের মোড়। আপিসের সময়। ইচ্ছে করেই যেন একটা দাঁড়িয়ে গেল তিন রাস্তার মুখে। কণ্ডাক্টর ঘন্টি বাজাল। তারপর বাধ্য হয়ে আসন ছেড়ে নেমে এল। বাধ্য হয়ে গায়ে হাত তুলল। ফল হল বিপরীত। গরুটা তিন কদম দৌড়ল, তারপর মাঝরাস্তায় শুয়ে পড়ল। পাকা পনের মিনিট লাগল তাকে সেখান থেকে হঠাতে।

দুই হাতে দুই থলি নিয়ে বাজার থেকে ফিরছিলেন ভদ্রলোক। ষাঁড়টা গেট-এ দাঁড়িয়ে ছিল। এখানেই থাকে। ওর পেছনের পা দুটো কে বা কারা অবশ করে রেখেছে। ফলে বেশী ঘোরাঘুরি করতে পারে না বেচারা। ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই যা পারে জোগাড় করে। তাতেও পেটটা তখন রীতিমত ভরা! তাহলেও স্বভাবদোষ। পেছন থেকে হৈ হৈ করে উঠল লোকেরা। ভদ্র-লোক ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন—তাঁর দু' আনার ডাটার আঁটিটার এক আনা অন্তত ততক্ষণে ওর পেটের পথ ধরেছে।

উদাহরণ বাড়িয়ে আর লাভ নেই। বুলগানিন আর ক্রুশ্চফ আসছেন কলকাতায়। মানিকতলার মোড় লোকারণ্য। কেউ

বলছেন,—'আর দশ মিনিট', কেউ বলছেন—'এই আসছেন! দেখলি না একটা মোটর-বাইক চলে গেল!' সবাই অধীর আগ্রহে চেয়ে আছে পথের দিকে। এমন সময় সহসা সেই ব্রাহ্মমুহূর্তে আসরে এসে হাজির হল কলকাতার জনৈক ধর্মপুত্তুর, প্রকাণ্ড এক ষণ্ড। চারদিকে হৈ হৈ হট্টগোল, ছুটাছুটি, ঠেলাঠেলি। সে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। কলকাতার মানহানির উপক্রম! শেষ পর্যন্ত তা হল না, পুলিস হস্তক্ষেপ করল। এবং ধর্মের ষাঁড় আবার পাশের গলিটায় ধর্মের পথ খুঁজে পেল।

* * *

কলকাতার ধর্মের ষাঁড়গুলোর সঙ্গে আমাদের ধর্মের যোগাযোগ যে সনাতন সেকথা বলাই বাহুল্য।

তবে ওয়াকিবহাল মহল বলেন, যে ধর্ম আজ নগরকে গোচারণ-ক্ষেত্রে পরিণত করতে চলেছে তার সবখানি সনাতন নয়। তাঁদের মতে, এ নগরের ষণ্ড-জনসংখ্যার অর্ধেক যে বিশেষ ধর্মচারণের ফল তার নাম—'বিজনেস এথিকস'। বাংলা করে বললে তার মানে ব্যবসায়িক ধর্মনীতি।

এই নীতিতে নাকি বলে যত অন্ধকারেই কুড়িয়ে থাক ব্যবসায়ে একটি পয়সাও তোমার 'কাল' নয়, যদি তার কিছু কিছু তুমি সৎপথে ঢাল। গো-সংবর্ধনা এবং গো-সেবা এ নগরে সেই সৎমার্গের অন্যতম একটি। সুতরাং উদ্যোগ করে ষাঁড় একবার ছাড়তে পারলেই যথেষ্ট। শ্রীকৃষ্ণের জীবটির অতঃপর আর অনাহারে মরবার ভয় নেই। এ শহরে ওর চালকলা জোগাবার লোক অনেক।

অন্য দল এই আশ্বাসটুকু ভর করেই নেপথ্যে বসে জমজমাট কারবার চালায়। শহরে গোয়াল আছে, খাটাল আছে। সুতরাং, সেই সংসারে ষণ্ডেরও দরকার আছে। লোকে বলে, সেই দরকারে

বারোয়ারী ষণ্ড নিয়ে রীতিমত কাড়াকাড়ি। কেননা ধর্মের ষাঁড় হলেও ওরা বেশ রোজগারী।

ফলে খাটাল-তাড়ান বালক-ষণ্ড এখানে পথে পথে পাঁচজনের আদরে বড় হয়, বাড়ে। ক্রমে রোজগার করে।

সুযোগ পেলে ধর্মের নামে উৎসর্গীকৃত বেকারেরাও সে তালিকায় নাম লেখায়। ফলে প্রশ্রয়ের সঙ্গে আশ্রয়টাও পায়। এ নগরে ষণ্ডের সংগঠনটা তাই এমন জোরালো এবং সে কারণে সমস্যাটাও তাই এমন ঘোরালো।

* * *

তবে কি এ সমস্যার কোন মীমাংসা নেই? হয়ত আছে, হয়ত নেই।

কলকাতাকে যাঁরা হাড়ে হাড়ে চেনেন তাঁরা বলেন—নেই। কলকাতা যতদিন থাকবে ততদিন ষণ্ডও থাকবে। কেননা বছরে চার ছ'টা মানুষ তার পায়ে এবং শিং-এ প্রাণ দেয় যেমন তার পিছু পিছু ঘুরে কিছু লোক প্রাণধারণও করে, তেমনি। ষণ্ডের সাইড প্রডাক্টগুলোও যে এ নগরে চালু ব্যবসা!

তদুপরি কলকাতার ষাঁড় এ নগরের অন্যতম দর্শনীয়ও বটে। ট্যুরিস্ট এ্যাট্রাকশান হিসেবে এর যত মূল্য—পশ্চিমীদের চোখে কলকাতার অন্য কিছু তেমন নয়। নগরের অভিভাবক হিসেবে কর্পোরেশনও তাই অক্ষম। শহরের আকর্ষণ বাড়ানটাই তাদের কর্তব্য, বিরোধী পক্ষও নিশ্চয় বলবেন না—কমানোটা!

তবে কি এই নিরীহ খুনীদের সঙ্গে বোঝাপড়ার দায়িত্ব পুলিসের? রাজপুরুষ হত্যার পর অন্তত তা-ই হওয়াটা ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু আমার মনে হয় সে চেষ্টায়ও বিশেষ কিছু হবে না। অভিজ্ঞতা অন্তত তাই বলে। চিৎপুরে নবকিশনের বাড়ী নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছিলেন লর্ড ক্লাইভ। বাড়ির দরজায় মহারাজের আগেই লাল

মখমলমণ্ডিত সেই মহামান্য অতিথিকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বসল পথচারী এক পাষণ্ড ষণ্ড। ক্লাইভ আহত হলেন। ফলে পরদিন সকালেই ধর্মের ষাঁড়ের ওপর ঘোষিত হল নির্বাসন-দণ্ড। ক্লাইভ হুকুম দিলেন অতঃপর তাদের গঙ্গার ওপারে থাকতে হবে।

সে হুকুমে যে কতখানি কাজ হয়েছিল আজকের কলকাতার চিৎপুর, বাগবাজার, মানিকতলা, বৈঠকখানার পথগুলোই তার সাক্ষ্য। আর সাক্ষী গোড়ার খবর ছুটো।

ক্লাইভের মত একেশ্বর 'বিধর্মী'কে জখম করেও যারা স্বর্গচ্যুত হয়নি, আশা করি গণতন্ত্রের সামান্য একজন কনস্টেবলকে খুন করার দায়ে তাদের পায়ে বেড়ি পড়বে না।

অষ্টগ্রহ ও আমরা

হওয়ার কথা ছিল অনেক কিছু।

ভূমিকম্প, প্লাবন, প্রলয় ; নেতৃবৃন্দের শারীরিক অনিষ্ট, দেশের আকস্মিক ভাগ্যবিপর্যয় ; মারামারি, কাটাকাটি, রকেট ছোড়াছুড়ি এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ;—কলিযুগ শেষ হয়ে যাওয়ার কথা, এতক্ষণে ভস্ম হয়ে পৃথিবীর মহাশূন্যের তরঙ্গে তরঙ্গে উড়ে বেড়াবার কথা।

পরিবর্তে কয়েক হাজার মণ ঘি ভস্মে ঢালা হয়েছে, কয়েক কোটি টাকা হাতে-বেহাতে স্থানান্তরিত হয়েছে, জনাকয় সাধু প্রহৃত অথবা অপমানিত হয়েছেন, জনৈকা বিদেশিনী বৃদ্ধার চুলের রং ফিরেছে এবং গ্রহের হাত থেকে জগৎকে বাঁচাবার জন্যে গৌহাটীতে একটি বাইশ বছরের তরুণ গলায় দড়ি দিয়েছেন।···সুতরাং, ফলিত জ্যোতিষ অবশ্যই হাতে হাতে ফলেছে! কিন্তু গ্লাডস্টোনের সেই ক্ষ্যাপা কুকুরটি কি সত্যিই মারা গেছে?

ফেব্রুয়ারীর ৭ তারিখ থেকেই রাস্তায় রাস্তায় আবার গণকেরা এসে গাছতলা দখল করেছেন যথারীতি ধূপধূনা জ্বালিয়ে, কলকাতার কয়েক শ' ছোটবড় জ্যোতিষ কার্যালয় আবার ঝাঁপ খুলেছে, তাদের অলৌকিক কর্মকাণ্ডের বিশদ বিবরণ সহ নতুন পঞ্জিকার বিজ্ঞাপনের পাতাগুলো দ্রুত ছাপা হচ্ছে, রোববারে রাশিফল নিয়ে যথারীতি টানাটানি চলছে এবং তারই মধ্যে সেপ্টেম্বরে আবার নতুন প্রলয়ের কথা উঠেছে। সুতরাং এতদিন যদিই বা চুপ করে থাকা যেত, এখন নিশ্চয়ই কথাগুলো বলবার সময় হয়েছে।

কমবেশী দায়ী সম্ভবত অনেকে।

প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল অবশ্য উজ্জ্বলতম ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রম পশ্চিমবঙ্গের দুর্ধর্ষ মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্রও। কেননা, এই বার্ধক্যেও আকাশের গ্রহকে তিনি সহাস্যে মাটিতে দেখতে সক্ষম হয়েছেন।

যাঁরা যাঁরা প্রকাশ্যে ভিন্নমত জ্ঞাপন করেছিলেন তাঁরা অবশ্যই বুদ্ধিমান। তবুও তাঁরাও আজ গণ্য। কেননা, এ আলোচনা বিশেষকে নিয়ে নয় যখন, তখন বোধহয় সকলের জন্য একই যোগজ ফল বাঞ্ছনীয়! (যদিও আমি জানি রাশিতে রাশিতে লগ্নে লগ্নে—ভিন্ন ফলই হয়ে থাকে।)

তবে সে কথা শুরু করার আগে আর একটা কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। এখনও আমাদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা মনে করেন—জ্যোতিষীরা সবাই ভারতীয় অথবা প্রাচ্য, কিংবা জ্যোতিষ এমন একটা বিদ্যা যা ভারতের পণ্ডিতেরাই জানেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তারা জানেন না—ঘটনা তা নয়। যতদূর খবর করতে পেরেছি তাতে অক্লেশে বলতে পারি, আমাদের লজ্জিত হওয়ার কোন হেতু নেই,—ব্যবসাটি প্রকৃতই আন্তর্জাতিক।

একটু চোখ মেললেই দেখা যায়। আমাদের 'সম্রাট', 'অর্ণব', 'রাজজ্যোতিষী'গণের উপাধি তালিকায় যে 'এ বি সি ডি'গুলো নক্ষত্রস্বরূপ আলো বিকিরণ করে আমাদের চোখ ধাঁধায়, সেগুলো প্রায় সবই জাতে বৈদেশিক।

যদিও অন্যতম দাবীদার আমরাও, জ্যোতিষ তবুও পশ্চিমের কাছে পশ্চিমী ব্যাপার। তাঁদের মতে তাঁদের পৃথিবীতে এর চর্চা চলেছে খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতক থেকে। এবং প্লেটো-প্লুটেমি, গ্রীক-রোম-আলেকজান্দ্রিয়া হয়ে সে চর্চা আজও পুরোপুরি অব্যাহত আছে।

সেকালের কথা বাদই দিচ্ছি। বিখ্যাত ভবিষ্যৎ-বক্তা নস্ট্রাডামাস ছিলেন ফরাসী সম্রাট দ্বিতীয় হেনরীর রাজজ্যোতিষী, নিকোলাস কাভাৎজার ছিলেন—ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরীর, কেম্ব্রিজ থেকে বিতাড়িত জন ডি ছিলেন সপ্তম এডয়ার্ড এবং প্রথম এলিজাবেথের, বিখ্যাত লিলি যিনি লণ্ডন অগ্নিকাণ্ডের কথা পূর্বাহ্নে জানতে পেরেছিলেন বলে জনশ্রুতি, তিনি ছিলেন প্রথম চার্লসের রাজজ্যোতিষী।

উল্লেখযোগ্য, রাজবাড়ীতে আগেকার সেই মর্যাদা মন্ত্রিসভা ইত্যাদি কেড়ে নিলেও আজকের ইউরোপে এখনও জ্যোতিষীর বিলক্ষণ খাতির রয়েছে! এখনও ইংলণ্ডে, শুধু ইংলণ্ডে নাকি হপ্তায় হপ্তায় খবরের কাগজে রাশিফল পড়েন এক কোটি পুরুষ এবং দেড় কোটি মহিলা। তাঁদের মধ্যে ষাট লক্ষ এমন আছেন যাঁরা কাগজ না পড়ে কোন কাজই করেন না। তাছাড়া মনে রাখতে হবে আমাদের বহু আগে থেকে পশ্চিম জ্যোতিষ বিষয়ে বহু সাপ্তাহিক মাসিক কাগজ চালাচ্ছে, গালভরা নাম দিয়ে মস্ত মস্ত 'বিদ্বৎ'সভা (!) খুলেছে এবং আমাদের দেশের বহু জ্যোতিষীই তাদের সেই সুনির্মিত কলে চলছে।

যথা: পঞ্জিকার বিবিধ তত্ত্বগুলো। নাকের পাশেই তিল দেখলে যাঁরা নানারকম তাল খোঁজেন তাঁরা জানেন না যে, সেই কাণ্ডজ্ঞান বর্জনের মন্ত্রটি পঞ্জিকা থেকে মুখস্থ করা হলেও সেটা জার্মানীর সম্পদ্। দেখবেন পাশেই তার লেখা রয়েছে—"জার্মান কেবিনেট অব্ কিওরিওসিটিস হইতে।"

তিলতত্ত্ব জার্মানীর, নৈসর্গিক গণনা জ্যাডিকেয়েলের, এবং স্বপ্নতত্ত্ব যেমন নেপোলিয়নের, তেমনি খবর নিলে দেখবেন ভারতের বহু কাগজে প্রকাশিত ইংরেজী রাশিফলগুলোও আসে বাইরে থেকে 'এয়ার মেলে'। মনে রাখবেন, আমাদের জ্যোতিষীরা পৃথিবীর মৃত্যুর খবর ঘোষণা করার বহু আগে ইতালীর কিছু উন্মাদ সেই মৃত্যুসংবাদ বিবেচনা করে মণ্ট ব্ল্যাঙ্ক পর্বতে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং এবার ক্যানাডার কোন কোন পণ্ডিত (!) আমাদের ভবিষ্যৎ-বক্তাদের চেয়েও জোর দিয়ে বলেছিলেন—সিংহল থেকে শুরু করে ভারতের উপকূল হয়ে কলকাতা ধরে, ব্রহ্ম সীমান্ত দিয়ে লাসা পর্যন্ত একটা রেখা বরাবর ভূমিকম্প এবার হবেই হবে! হয়ত ওঁরা ভেবেছিলেন আমাদের জননেতা এবং ধনপতিদের সমর্থনে সবটুকু কাজ নাও হতে পারে! সম্ভবত তাই এই সৌহার্দ্যমূলক গুজবটি রটান হয়েছিল।

—তাই বলছিলাম ব্যবসাটি আন্তর্জাতিক! নয়ত কলকাতার জ্যোতিষ কেন নেবেন বিলিতি পদবী এবং জলন্ধরের জ্যোতিষী কেন তাঁর আশ্রমের নাম রাখবেন—'বেঙ্গল মেসমেরিজম হোম'; আর কেনই বা খাস ওয়েস্ট এণ্ড-এর জ্যোতিষী বিজ্ঞাপন দেবে 'ইণ্ডিয়ান' 'বুডিস্ট' 'টানট্রিক' ইত্যাদি বলে! আমাদের বাংলা পঞ্জিকা কিংবা ইউরোপের কোন 'প্রেডিকেশান কাগজ' খুলুন ভুরি ভুরি নমুনা পাবেন তার।

ছুনিয়ার আর সব ব্যবসায়ের মত ডিমাণ্ড-সাপ্লাইয়ের প্রশ্ন এখানেও নিশ্চয় আছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা আমাদের দেশে এ ব্যবসা যাঁরা চালান তাঁদের মাথা আছে। সে মাথায় তুখোড় মার্কেটিং সেন্স।

সব মানুষের এক রুচি নয়। কেউ বড় বড় কারখানার ক্ষমতায় আস্থাবান, কেউ কুটিরশিল্পে, কেউ মিলের কাপড়ে, কেউ ছাপা শাড়ীতে, কেউ হাতে কেউ বাহুতে। এ বাজার সকলের জন্যে।

—কিসে বিশ্বাস আপনার? মাত্বলিতে? ভয় নেই, তা আছে। সর্বশক্তি মহাবলী তাবিজ ধারণ করুন। একটি নয়, দরকার হয় তিনটি নিন। "মূল্য প্রতি কবচ—১·৯৪ নয়া পয়সা, তিনটি একত্রে—৪·৭৫ নয়া পয়সা।" আশঙ্কার কোন কারণ নেই, কেননা ছাপা হরফে বলা হচ্ছে "ইহার জন্য গ্যারান্টি দিতেছি।... যদি এই কবচে কোন উপকার না হয় তবে মূল্য নগদ ফেরত দেওয়া হইবে এবং মিথ্যা প্রমাণ করিলে নগদ দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।"

এতেও যদি বিশ্বাস না হয় কারও, তবে তিনি সম্মোহিনী অঙ্গুরী, তান্ত্রিক সুরমা, মুহব্বতকি ডোরি—যা ইচ্ছে তাই নিতে পারেন। দাম—মাহাত্ম্য বুঝে পাঁচসিকে থেকে একশ' উনষাট টাকা উনষাট নয়া পয়সা!

এ বাজারে সব রকম বস্তুই আছে। একটি ১৫৫০৲ টাকা পুরস্কারের ঘোষণা-সম্বলিত বিজ্ঞাপনে দেখছি ইদানীং লক্ষ্মীযন্ত্র নামে এক ধরনের টাকা রোজগারের যন্ত্রও পাওয়া যাচ্ছে। 'চালাইবার কৌশল আদৌ কঠিন নহে।' দামও সস্তা। 'তামার কেসে একটির মূল্য—১·৯৪ নয়া পয়সা, চারিটি উদ্দেশ্যসাধনের জন্য স্পেশাল সুপার পাওয়ারফুল ৪নং যন্ত্রের মূল্য—৫·২৫ নয়া পয়সা।'

'আজব আয়না' নামক আর একটি অঙ্গুরী, ঐন্দ্রজালিক সুগন্ধি, প্রেমের বস্তুর বিজ্ঞাপনে দেখতে পাচ্ছি লেখা হয়েছে 'এই আয়না আমেরিকার বিখ্যাত হিপনোটিক এসোসিয়েশন কর্তৃক সৃষ্ট এক আশ্চর্য সৃষ্টি', এবং ক্রেতারা এর দিকে তাকিয়ে ভূত-ভবিষ্যৎ যেমন জানতে পারবেন তেমনি অর্ডার দিলে এক শিশি মোহিনী অটো, এক জোড়া যাদু চশমা এবং সুবেশা কয়েকটি ফরাসী রমণীর ছবিও সঙ্গে পাবেন।—এত বস্তু বোধহয় আধুনিক কোন পণ্যের বিক্রেতারাও একসঙ্গে উপহার দিতে পারেন না। সে কারণেই বলছিলাম—ওঁরা বাজার জমানোর কৌশল জানেন। নয়ত এসব বিজ্ঞাপনেও কেন লেখা থাকবে—'গভর্নমেণ্ট বিচার নির্মুক্ত বিজ্ঞাপন!'—হায়, সরকার!

* * *

যাঁরা উপরের স্তরের কারবারী তাঁরা কখনই 'ফুল আপনার ভাগ্য বলিয়া দিবে' বলে দাবী করেন না। তাঁদের পথ ভিন্ন। চিঠি লিখলে যে কেউ তাঁদের কাছ থেকে যে মুদ্রিত চিত্রযুক্ত কাগজটি পাবেন তাতে দেখবেন—তিনি কি করতে পারেন—এর চেয়ে অনেক বেশী আছে—তিনি ইতিমধ্যে কি কি করেছেন তাই।

একজনের মুদ্রিত দাবী—তিনি গেল মহাযুদ্ধ লাগবার আগেই বলেছিলেন—যুদ্ধে ইংরেজেরা জিতবে, দেশ স্বাধীন হওয়ার আগেই বলেছিলেন—দেশ স্বাধীন হবে, অমুক মামলায় অমুক পক্ষ জিতবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

অন্য একজন বলেন, তিনি ইউরোপকে এই বিজ্ঞানে বিশ্বাসী করেছেন, মিসেস সিমসনের ঘটনার সময়ে আমেরিকাকে তাক লাগিয়েছেন, বিহারের ভূমিকম্পে বহু ইনস্যুওরেন্স কোম্পানিকে সাবধান করেছেন এবং ইত্যাদি ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য, প্রতিটি ঘটনায় তাঁর হাতে সাক্ষী আছে। সুতরাং, আসুন আমাকেই হাত দেখান। খরচ—হাত দেখালে—১০৲—১৫৲, কোষ্ঠী বা ঠিকুজী বিচার করালে—২০৲—৬০৲, যোটক বিচারে—১০৲—৬০৲; প্রতি প্রশ্ন গণনা—৪৲—৬৲, ঠিকুজী রচনা—৫৲—১২৲, কুষ্ঠি প্রস্তুত—৩০৲—৩০০৲ টাকা!

ওঁরা প্রায় সকলেই 'রাজা', 'রাজাধিরাজ', 'রাজচক্রবর্তী', 'নৃপতি', রাজজ্যোতিষী', মহামান্য বেঙ্গল গভর্নমেণ্ট বা স্বাধীন নৃপতি সকল' এঁদের বিশ্বাস করেন, হাইকোর্ট এঁদের পরামর্শ নেন, জেলখানার কয়েদীরা এবং ফটকা বাজারের 'ষণ্ডরা' ওঁদের থেকে মন্ত্র নেন; সুতরাং—খরচ একটু পড়বে বৈকি!

যাঁদের তা জোগাবার সাধ্য নেই তাঁরা রাস্তায় হাতখানা মেলে বসে যান। সেখানে ফুটপাথে বিভ্রান্ত পথচারীর ভাগ্যের ছক কাটা আছে, তাসের খেলা আছে, ষাঁড়ের পাণ্ডিত্য আছে, টিয়াপাখীর মুখে ভাষা আছে, সস্তার আংটি আছে—এবং যা চাই তাই আছে। উল্লেখ্য, ইউরোপে জ্যোতিষী থাকলেও লণ্ডন-প্যারীর পথে পথে এত বস্তুর সমারোহে নেই। সপ্তদশ শতকের পর থেকে কোন আধুনিক রাষ্ট্রে সেখানে যেমন 'রাজজ্যোতিষী' নেই, তেমন নেই—তাবিজ-মাদুলির এই বিচিত্র ব্যবসাও। কেননা সুদূর ১৮২৪ সন থেকে ইংলণ্ডের মত অনেক দেশেই সেখানে আইন আছে। এবং তদনুযায়ী এ ব্যবসা বে-আইনী। ইংলণ্ডের আইনটিতে স্পষ্ট বলা হচ্ছে:

'...every person pretending or professing to tell fortunes or using any subtle craft, means or device, by plamistry or otherwise, to deceive and impose on

any of His Majesty's subjects···shall be deemed a rogue and a vagabond.'

কেননা, যতবার তাদের ভবিষ্যৎ বাণীতে কান দেওয়া হয়েছে ততবারই দেখা গেছে মানুষ ঠকছে।

ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতি অফুরন্ত।

ইউরোপের মনে আছে ফ্রান্সের জনৈক বিখ্যাত জ্যোতিষী যে বছর বলেছিলেন—সমুদ্র ফরাসী দেশকে গ্রাস করবে সে বছর ফ্রান্সে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতও হয়নি।

'৩৯ সনে তামাম ইউরোপের জ্যোতিষীরা একজোট হয়ে বলেছিলেন—হিটলার কখনও লড়াই করবে না। তাঁর কুষ্ঠি লড়াইয়ের নয়।

যুদ্ধ লেগে যাওয়া মাত্র ওঁরা আবার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—ইটালী জার্মানীর সঙ্গে কিছুতেই যোগ দেবে না,—দিতে পারে না। তৃতীয় ভবিষ্যৎবাণী হল—জার্মানী সুইডেনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বলে! বলা নিষ্প্রয়োজন—একটাও সত্য প্রমাণিত হয়নি।

গেল বছরের পঞ্জিকা খুলুন। দেখবেন এ জাতীয় উক্তি সেখানেও পাতায় পাতায় প্রচুর। সেখানে ব্যক্তিগত, রাষ্ট্রগত বর্ষফলে অনেক খবর পাবেন, কিন্তু কোথাও আছে কি 'ভারত কর্তৃক গোয়া অধিকারের খবর ?—নেই।

—কোথাও শোনা গেছে কি কিছুমাত্র ফলেছে অষ্টগ্রহের যোগজ ফল ? না। তবুও এখনও কেন নীচস্থ শনি অষ্টমে আসছে না ?—কেন দুর্বল মঙ্গল দ্বাদশে আসনপিঁড়ি হয়ে বসছে না ?—কেন ?—কেন ? রাজার কাছে তার জবাব চাই।

ডায়াল নাইন নাইন

—না …ই…ন,—না…ই…ন!

—হ্যালো, হ্যাল্লো মিস!

তারের ওপারে দুটো ছেলের মা মালতী হাসল।

—নাইন্ সিক্স?

—হ্যালো,—ইউ সি,—আজ সন্ধ্যেয় হাতে সময় পেয়েছি একটু!—তা—

—তা, কি জানতে চান বলুন!

—নাঃ, ভাবছি সিনেমায় যাব একটু।

—কি বই দেখবেন?—তাই না?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ—আই সি ইউ আর এ স্মার্ট গার্ল।

মালতী দিনের কাগজখানা তুলে নিল হাতে।—'এ নাইট টু রিমেম্বার' দেখতে পারেন কিংবা 'ইট হ্যাপেনড টু জেন'—অথবা —অথবা 'দো ওস্তাদ', 'সুজাতা'—। গড়গড় করে কাগজের ওপর চোখের সঙ্গে ফোনে মুখ চালিয়ে চলল মালতী। হঠাৎ ভদ্রলোক উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন যেন। —না, না আর দরকার নেই।—সেই যে প্রথমে যেটা বলেছিলে সেটাই বল।—কি বলেছিলে যেন, এ নাইট টু—এ নাইট টু—।

—ইয়েস,—এ নাইট টু রিমেম্বার।

হাউসের নাম বলল মালতী এবং তার ফোন-নম্বর। কিন্তু তবুও ছাড়লেন না ভদ্রলোক।

—হ্যালো, বইটা কি দেখেছেন আপনি?

—নো, প্লি…জ।

—তাহলে চল না আমার সঙ্গে। দুজনে দেখা যাবে। আই ইনভাইট য়ু। ডু ইউ একসেপ্ট ? —বল, কোথায় থাকবো ?

রিসিভারটা নামিয়ে রাখল মালতী। তাই রাখতে হয় এসব ক্ষেত্রে। কারণ, নম্বর জানতে চাইলে ভদ্রলোকই নামিয়ে রাখবেন ধপ করে। ও যে সত্যই বিরক্ত হয়েছে, ওটা আর জানানো হবে না তাকে। অসম্মতি বা বিরক্তি জানাবার এই-ই একমাত্র পথ 'ডায়াল নাইন নাইন'-এ।

তিন মিনিট সময় নষ্ট করেছেন ব্যস্ত কাজের লোকটি। এই তিন মিনিটে কমপক্ষে আরও তিনটি উত্তর দেওয়া যেত এখান থেকে। এই মাত্র রেসে যে ঘোড়াটি জিতে গেল তার নাম, কিংবা রেডিওর গোলে যে গোলটি কান থেকে এই এক্ষুণি হারিয়ে গেল তার হদিস অথবা খিদিরপুর ডকে 'হেলেনিক গ্লোরি' নামে মার্কিন জাহাজটি পৌঁছেচে কিনা তার-ই সঠিক খবর।

এ ছাড়াও 'নাইন সিকস্'-এ ডায়াল করে আপনি জানতে পারেন 'থ্রি-এ' এবং থ্রি-বি'র রুটের মধ্যে সত্যিকারের পার্থক্য কোথায়, ট্রামের ৩ নম্বর কোন পথে চলে এবং কলকাতা থেকে ফেরীতে হাসনাবাদ যাওয়া যায় কিনা, ইত্যাদি। এমন কি পাইক-পাড়া থেকে যে দোতলা বাসগুলো যাতায়াত করে সেগুলোর মধ্যে কতকগুলো লাল আর কতকগুলো কালো রং-এর কেন,—তাও জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেবে 'নাইন সিক্স'। কারণ, ডায়ালটির বয়স মোটে কয়েক মাস হলেও এখানে যে ষাট-সত্তরটি মেয়ে বসে তারা তিন মাসের মামুলি ট্রেনিং-পাওয়া 'টেলিফোন-গার্ল' নয়। ব্র্যাডশ, গাইড, টাইম-টেবিল ইত্যাদি চটপট দেখার অভ্যেস তাদের চোখে, কলকাতার পথঘাটের নিশানা তাদের মুখে মুখে। শুধু কাল বৃষ্টি হবে কিনা তাই বলা নয়,—কেন হবে না তাও মোটামুটি বুঝিয়ে বুঝিয়ে বলতে সমর্থ তারা। তারা 'নাইন নাইন' -এর জন্যে বিশেষভাবেই তৈরী। সুতরাং 'টেলিফোন গাইডে'র

দ্বিতীয় পাতাটি খুলুন। রিসিভার তুলে এবার জিজ্ঞেস করুন—দশ দফা প্রশ্নের যে কোন একটি। দেখবেন মুখে মুখে তার উত্তর।

শুধু তাই নয়।—আপনি কি নিদ্রায় কুম্ভকর্ণ ? কিংবা বিনা কারণে আইনস্টাইন ? তবে জানবেন 'নাইন সিক্‌স'ই এ শহরে আপনার একমাত্র সত্যিকাবের বান্ধব। নিজ চরিত্রগুণে 'বান্ধবী'ও ভাবতে পারেন। ক্ষতি নেই।—নাইন সিক্‌স-এর কর্তব্যে নড়চড় হবে না তাতে। আবেদন করলে সে তবু আপনার ঘুম ভাঙাবে। ট্রেন হাওড়ায় পৌঁছাবে ভোর ছ'টায়। আপনার ঘুম ভাঙে চিরকাল আটটায়। কে ডেকে দেবে আপনাকে ? চাকর ? কিন্তু তার নিদ্রাও তো জানেন প্রভুর আদর্শেই তৈরী। অথচ সুমিত্রা যদি ভাবে পুরো ছ' মাস পরেও একটি দিনের জন্যে অন্তত আপনি ছ'টায় বিছানা ছাড়তে পারলেন না ওর জন্যে, তবে ব্যাপারটা কোন্ অবধি গড়াতে পারে অনুমান করে নিশ্চয় শিউরে উঠছেন আপনি। —ডায়াল করুন—নাইন সিক্‌স।

—হ্যালো, কাল ভোরে কাইণ্ডলি পাঁচটায় ডেকে দিতে পারেন আমায় ?—বুঝতে পারছেন তো। সুমিত্রার ট্রেন পৌঁছবে ছ'টায়, আমি উঠি জেনারেলি আটটায়।

—হ্যালো, মান থাকবে না,—বুঝতেই পারছেন—

ওপার থেকে বুঝে কিন্তু ততক্ষণে আপনার নম্বরটি টুকে নেওয়া হয়ে গেছে। সাত ঘণ্টা ডিউটি। কে তখন থাকবে, কে জানে। সুতরাং কোন হিস্ট্রি না শুনে শুধু ডাকবার সময় আর নম্বরটা জেনে নেওয়াই নাইন নাইন-এর পক্ষে যথেষ্ট···তবে—এবিষয়ে নিঃসন্দেহ থাকুন। ডাক আপনি শুনবেন-ই। পয়সা সাধারণ 'কল'-এর দ্বিগুণ দিতে হবে, কিন্তু তার বিনিময়ে যা পাওয়া গেল সেটা কি কম ?

—হ্যালো,—নাইন নাইন ? —দেখুন, অনুরাধার সঙ্গে আমার

এপয়েন্টমেন্ট আগামী মাসের চৌঠা।—একটু মনে করিয়ে দেবেন। আমার এনগেজমেন্ট-প্যাড আছে বটে, কিন্তু অনেক সময় সেটা-ই ওল্টাতে ভুলে যাই!

—অথচ বুঝতেই পারছেন, ভুলো মন নিয়ে মেয়েদের সঙ্গে চলার কত বিপদ।

নাইন নাইন'এর মেয়েদের সমস্যা কিন্তু আপনাদের মত পুরুষকে নিয়ে চলা বা কথা বলা। ট্রেনিং এবং কাণ্ডজ্ঞান অনুযায়ী এটা তারা সবাই জানে, আপনার পনের আনা কথাই অবান্তর। এবং ফলে স্বভাবতই আপনাকে তারে ধরে রাখাটাও সময়ের অপচয়।

কিন্তু ক'জন সাবস্ক্রাইবারই বা তা জানেন? জানলেও সে অনুযায়ী চলেন? টেলিফোনের মেয়েরা বলেন—জানেন সবাই, কিন্তু মানেন কম।

হ্যালো—এক ভদ্রলোক রীতিমত জরুরী গলায় নাইন নাইন-এ জানতে চাইলেন—হ্যালো, ললিতা কি কলকাতা এসেছে?—হ্যালো।

—হেডফোনটা একটু সরিয়েই মাথা চুলকাতে হল নাইন নাইন-কে। —ললিতা? —কে ললিতা?—এখানে তো ললিতা বলে কেউ কাজ করে না।

—হ্যালো—আই মিন—সে-ই যে সেন্‌সেনাল বই—মেয়ে, —ফরেন অথরের লেখা।—হ্যালো।

সৌভাগ্যবশত ২টা-৯টায় যিনি ছিলেন, সেদিন তিনি এক্তিয়ারের বাইরের অবশিষ্ট কাগজটুকু পড়তেন। সুতরাং উত্তর হল, 'বোধ হয় না, আপনি বরং কোন পাবলিশারকে ফোন করুন।'

হ্যালো—হাউ ডু ইউ স্পেল—জারেকজেস্? —হ্যালো!

নাইন নাইন অবাক হয়ে ভাবে—এ কি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কেউ, কিংবা কোন মাথাখারাপ অধ্যাপক অথবা—। বাধ্য হয়েই কেটে দিতে হয় লাইন।

তবুও একটা নির্দোষ প্রশ্ন। কিন্তু কি উত্তর হবে বলুন, যদি কেউ জিজ্ঞেস করে—আচ্ছা, ভারতের পাভলোভা বলে যাকে এনতার পাবলিসিটি দিচ্ছেন আপনারা—এটা সেই মেয়েটা না অমুকের সঙ্গে যে আমেরিকা গিয়েছিল ?—হুঃ, যত্ত সব !

অথবা—

—হ্যালো !—নাইন নাইন ? আচ্ছা 'স্কাইরুম'টা কোথায় বলুন তো ? আপনার ঘরটার উপরেই ? —হ্যালো, আমি তো শুনেছি আপনাদের বাড়ীটাই কলকাতার সেরা স্কাইস্ক্রেপার ! —কিন্তু আপনাদের চিলেকোঠায় হোটেল আছে একটা জানতুম না তো !

বা—

—হ্যালো, চটপট বলুন দেখি, ছাতা নিয়ে বেরুব না না-নিয়ে ? মেঘ তো দেখছি কালো হয়ে এলো,—কাগজেও লিখেছে বটে আজ বৃষ্টি হবে। কিন্তু এক্ষুণি হবে কি ?—এই ধরুন মিনিট কুড়ির মধ্যে ? —বলুন চটপট,—নেব কি নেব না !—নেব ?

চব্বিশ ঘণ্টায় চারটে মেয়ে, গড়ে এক হাজার প্রশ্ন। কোথায় সেই সূচীপত্রের দশ দফা। হেন প্রশ্ন নেই যা না আসে নাইন নাইন-এর কানে। গাইড, খবরের কাগজ, টাইম-টেবল, ওয়েদারের রিপোর্ট তুচ্ছ। ছোটদের 'জ্ঞানের আলো' থেকে শুরু করে 'ইয়ার বুক' সাইক্লোপিডিয়া সব গুলো খেলেও সম্ভব নয় তার ষোলআনা উত্তর। তবুও বিরক্তিতে ঝালাপালা কান দুটো খাড়া করে একটানা বসে থাকতে হবে সাত ঘণ্টা। ভোর পাঁচটায় যে বাবু স্ত্রীর অভ্যর্থনায় বের হবেন, তাকে ডেকে দিতে হবে রাত চারটেয়। ফাঁকে ফাঁকে হয়ত আসবে দশটা জরুরী এবং যথার্থ জিজ্ঞাসাও।

—হ্যালো,—নাইন নাইন !—তিনটে বাজে আপনি এখনও জেগে ? কিছুতেই ঘুমুতে পারছি না ;—কি করি বলুন তো—

—হ্যালো,—আপনার দেখি আমারই অবস্থা !—আই এম সরি ফর ইউ !

—হ্যালো—ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি ? হ্যালো—

কি চায় এরা ? অটোমেটিকের ছোঁয়ায় যে দূরভাষিণীরা দূরবর্তিনী, তাদের নাইন নাইন-এর ঘুলঘুলি দিয়ে হাত বাড়িয়ে ধরতে চায় ? কিংবা সত্যিই চায়—ঘুমের ওষুধ !

★ ★ ★ কৃপাহি কেবলম্

ঘরে যাদের একটুকরোও কোম্পানির কাগজ নেই, লয়েডস কিংবা গ্রিণ্ডলে'র একখানাও চেক-বই নেই, বছরে যাদের তু'বার ইনক্রিমেণ্ট বা তিনবার বোনাস নেই, অথচ যাদের ঘর ভর্তি সংসার আছে, তিরিশ দিনের মাস আছে, মাসে মাসে অস্থখ, উৎসব কিংবা উপহার আছে, এমনকি ছোটখাট সাধআহ্লাদও আছে—সেই রিকশওয়ালা থেকে মাঝারি কলমওয়ালা, মুটে-মুদি থেকে নামমাত্র ম্যানুফ্যাকচারার্স—কি করে আজও তারা প্রবল বিরুদ্ধতার মধ্যে বেঁচে আছে আমাদের সমাজে? সে কি, কোন যাত্ন? অথবা, ঈশ্বরের অপার করুণা? কিংবা, কোন বিশিষ্ট জীবন-প্রক্রিয়া?

যদি তৃতীয়টিই সত্য হয় তবে কি সেই কৌশল যাতে রাতারাতি কপালে আরও তিনটে রেখা বেড়ে যায় বটে, কিন্তু তবুও একটু অসময়ে হলেও নির্বিঘ্নে বিয়ে হয়ে যায় চতুর্থ মেয়েটার, উঠি উঠি করছিল যে দোকানটি তার রেকগুলো আবার ভরে তোলা যায়, পা ভাঙ্গা বেকার রিকশাটাকে আবার চালু করা যায়, এমনকি দরকার হলে মাসের শেষ সপ্তাহেও ছেলেটাকে বড় ডাক্তার দেখান যায়! বলাবাহুল্য, সেই অফুরন্ত প্রাণধারাটি নেপথ্য বাহিনী। তার সন্ধান পেতে হলে আমাদের তাকাতে হবে সমাজের আরও পাঁচটি কোণে—মানুষ যেখানে মানুষকে বাঁচানোর (!) চেষ্টায় কোমরে টাকা নিয়ে ঘুরছে, কি করে সেই স্থখকর প্রস্তাবটা তোলা যায় দিনের পর দিন নিষ্ঠাভরে তার স্থযোগ খুঁজছে, এবং রাশি রাশি টাকা যেখানে শুধু একটি সহির অপেক্ষায় ফরাস বিছিয়ে দিন গুণছে। এ-কাহিনী সেই বিস্ময়কর জগতের কাহিনী, বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করা যে জগতের বাসিন্দাদের ব্যবসা! ধর্ম নয়, স্বভাবও নয়—জীবিকা।

ইনক্রিমেণ্ট হলে সে 'দেড়া' চাইতে পারে, প্রমোশন হলে 'দুনা' চাইতে পারে এবং সে ধরনের কোন স্পেশ্যাল কেস না হলে মাসে টাকায় এক আনা। অর্থাৎ, পঁচাত্তর ট্যাকা।

তা হোক, তা হলেও—দরোয়ানজী মৃতসঞ্জীবনী। কেননা, এদিক সেদিক ছুটাছুটি না করে চেয়ারে বসেই টাকা পাওয়া যায়। লেনদেনটা বহুকাল গোপন রাখা যায় এবং কথা ঠিক রাখতে পারলে সংসারে নির্ভয়ে চলাফেরা করা যায়।

কলকাতার আপিসে আপিসে মধ্যবিত্ত কেরানীর কাছে দরোয়ানরা তাই এক নম্বর কেরানী-সখা। মাসকাবারে মাইনেটি ছাড়া কেবিনের ভদ্রলোকদের কাছে কোন ভরসা নেই। ডাইনে বাঁয়ের টেবিলগুলোর চা-টোস্ট পর্যন্ত এগোলেই যথেষ্ট। সেখানে টাকা চাইতে গেলে নির্ঘাৎ সেই ইংরেজী পদটি শুনতে হবে যার মর্ম : আমার টাকা ছিল এবং আমার বন্ধু ছিল…ইত্যাদি ; সুতরাং অনিবার্য পরিণতি হোয়াইট কলার আর গ্রীন কলারের বন্ধুত্ব। মনে মনে যার সমুখেই একটা আয়ত্ত বহির্ভূত বাজেট আছে, সেই বুড়ো কেরানী বলে—এ বন্ধুত্ব দীর্ঘস্থায়ী হোক।

কেননা, যদি তা না হয় তবে ঘর ছেড়ে বাইরে ছুটতে হবে। বাইরে মানে সোজা বিদেশে। অবশ্য বহু নগর প্রান্তর এবং গিরিপথ অতিক্রম করে সেই বিদেশী বান্ধব দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবুও কেরানী বা নট-কেরানী মধ্যবিত্ত সহসা তার কথা ভাবতে চায় না। বুকটা কেন জানি দুরু-দুরু করে।

যিনি নিজের মুখে এই কথাটা স্বীকার করলেন—তিনি সেই আপিসেই কনিষ্ঠ কেরানী। (অবশ্য বয়সে বৃদ্ধ)। ব্যুরোক্রেটিক মেলবন্ধন অনুযায়ী কেরানী আর দরোয়ানে কোন সমাজ কেন, সঙ্গও হয় না। কিন্তু সে আপিসের সময়ে। তার আগে বা পরে, দরোয়ানের ছোট খুপরীটিতে বেয়ারা থেকে বড়বাবু সকলের

আসাযাওয়া চলে। কেননা, নিজ নিজ চেয়ারের মান রেখেই লোকটার সঙ্গে মনের কথা বলা চলে।

সে কথা—সব সময়ই পারিবারিক। যথা, 'বাড়িভাড়াটা বাকী পড়ে আছে' 'বাড়িতে কয়েকজন কুটুম্ব এসে পড়েছে' ইত্যাদি থেকে 'মেয়েটার সম্বন্ধ ঠিক করে ফেলেছি' কিংবা 'এক টুকরো জমি পাওয়া গেছে কলোনীতে, কিছু টিনের ব্যবস্থা যদি করতে পারতাম'—পর্যন্ত সব। লোকটার মন আছে। অর্থাৎ টাকা আছে। সুতরাং, আলোচনাটা একেবারে মাঠে মারা যায় না। কাজ হয়। শর্ত নানাবিধ। হয়ত সুদের বদলে বেচারা একটা লিফট (যথা হেড-দরোয়ান) চায়, কিংবা একটা ভাতিজাকে হুজুরকা কীপামে ঢুকাতে চায়, অথবা 'সিরেফ কুছ নেই মাংতা'। মানে—বড়বাবুকে চির-কালের মত হাতে রাখতে চায়। এ ছাড়া অন্যবিধ শর্তও হতে পারে।

দারোয়ানজীর পরেই গরীবের ভরসা—ভ্রাম্যমান সিন্ধুক, ওরফে আফগান-ব্যাঙ্ক।

দৃশ্যটা দেখতে হলে যে কোন 'পে-ডে'তে কর্পোরেশনের লাল বাড়িটার পেছনে একবার আসা চাই।

যেন জালালাবাদের পথে আফগান সেনাবাহিনী। ফুটপাথের এখানে ওখানে যূথবদ্ধ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে রাশি রাশি কাবুলী-ওয়ালা। দেখতে কেউ তারা রবীন্দ্রনাথের রহমতের মত নয়। হাতে তাদের তৈলমার্জিত লাঠি, মুখে মেহদী-মাখা দাড়ি, মাথায় সিল্কের পাগড়ী। সীমান্ত-প্রহরীর মত সতর্ক পায়ে তারা পায়চারী করছে, আর ঘন-ঘন ঘড়ি দেখছে।

সহসা কে যেন ইঙ্গিত করল। সঙ্গে সঙ্গে যে যেখানে ছিল সবাই ছুটল গেটের দিকে। কয়েক মুহূর্ত হুড়োহুড়ি দৌড়াদৌড়ি। অবশেষে দৃশ্যটা যখন আবার স্থির হল, তখন দেখা গেল, কারও গলদেশে কাবুলীওয়ালার সিল্কের পাগড়ীটা গামছার কাজ করছে, কারও পাকাটির মত হাতটা একটা মাংসাল হাতের কোলে থরথর

করে কাঁপছে, কেউ টাকা গুণছে, কেউ কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করছে, এবং ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এঁরা কেরানী নন। আরও একটু নিম্নবিত্ত। সুতরাং, আদায়ের প্রক্রিয়াটাও যথাসম্ভব নিম্ন। দেখতে রীতিমত অস্বস্তিকর, ভাবতে আপত্তিকর।

কেরানী বা দোকানীদের পক্ষে পদ্ধতিটা আর একটু মার্জিত হলেও সুদের হারটি প্রায় সব ক্ষেত্রেই সমান। আফগানব্যাঙ্ক-এর রেট অব ইনটারেস্ট শতকরা মাসিক সাড়ে বার টাকা। তবে সেক্ষেত্রে সুদটি অগ্রিম দেয়। অর্থাৎ, একশ টাকা ধার নিতে গেলে খাঁ সাহেব আপনাকে দেবে—মোটে সত্তর টাকা।

জানবেন, এটা নেহাৎ আপনি ভাল আপিসে কাজ করেন বলেই পেয়ে গেলেন। একশ টাকায় সত্তর টাকা কাবুলীওয়ালার হাত থেকে সবাই পায় না। লোক বুঝে 'পাবলিকের' জন্যে তার সুদের হার কখনও টাকায় চার আনা (মাসিক), কখনও ছু-আনা।

কি করবেন ? আসল মেরে দেবেন ? —তাও কি কখনও হয় ? লোকে বলে, এই বিদেশী বান্ধবদের ফাঁকি দেওয়ার একমাত্র পথ দেশ ছেড়ে বিদেশী হয়ে যাওয়া। তবে, তারা এটাও বলেছে—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সে কর্ম করতে গেলে শেষ পর্যন্ত তা ঘুরে-ফিরে আত্মসমর্পণেরই সামিল হবে। কেননা, কাবুলীওয়ালাদের 'সিয়াটো' নাকি আরও নিশ্ছিদ্র।

এমত অবস্থায় যদি কেউ সত্যিই ভয় খেয়ে যান এবং কিছুতেই যদি তিনি কাবুলীওয়ালার কাছে হাত পাততে রাজী না হন, তবে তিনি কি করবেন ? বলা বাহুল্য, মুখে অস্বাভাবিক রকমের গাম্ভীর্য সহ তিনি গুটি গুটি ঘরে ফিরে আসবেন। এবং বলা নিষ্প্রয়োজন, আসা মাত্রই কোন অপ্রত্যাশিত মনিঅর্ডার কিংবা ভুলে-যাওয়া কোন লটারীর ফল শোনাবার জন্যে গৃহিণী ছুটে আসবেন না। তাই বলে নিরাশ হওয়ার কারণ নেই।

ধীরে সুস্থে জামাটা খুলুন। ধীরে সুস্থে কথা বলুন। দেখবেন—সেই অন্ধকার ঘরেই ধীরে ধীরে আলো ফুটছে। পথ দেখা যাচ্ছে।

বাক্সের তলা, লক্ষ্মীর ঝাঁপি, রান্নাঘরের তাকের কোণ—এগুলো তুকতাক। তার কথা হচ্ছে না। এমন কি তিনি যদি নিঃশব্দে অনাবশ্যক আওয়াজ করে মৃত্তিকা-নির্মিত তথাকথিত ঐ সেভিংস ব্যাঙ্কটি ফাটিয়ে ফেলেন, সেটা নিয়েও অত্যধিক ভাবা ঠিক হবে না। কেননা, এটিকে মাসে তিনবার জন্মাতে হবে বলেই না এ বাড়িতে তা মাটিতে তৈরী!

আসল ভাবনা যে অঙ্কটার, মাথা খাটিয়ে কৌশলে একবার তা শুধু ঐ মাথাটিতে ঢুকিয়ে দিন। দেখবেন, কাজ হয়ে গেছে।

কি করে হল সে একটা প্রশ্ন বটে। তবে, এসব ব্যাপারে পুরুষের অনাবশ্যক কৌতূহল না দেখানই ভাল। তবুও একান্তই যাঁরা জানতে চান তাঁদের জন্যে বলতে হচ্ছে।

প্রক্রিয়াটা নানাবিধ হতে পারে। প্রথমতঃ, আপানার ঘরে একটা পোস্ট আপিসের বই না থাকলেও পাশের ঘরে অনেক কিছু থাকতে পারে। ফলে, বৈজ্ঞানিক নিয়ম অনুযায়ী দুই ঘরের গৃহিণীর মধ্যে সখ্যের কোন সম্ভাবনা নেই। তবুও মনে করুন নিপাতনে সিদ্ধ-এর মত তাই হয়েছে। এবং দিনে দিনে বাধ্য হয়ে এ-ঘরের দিদি ও-ঘরের দিদির কাছে হাত পাততে শিখেছে। এটা সম্পূর্ণত বন্ধু-গত। নিজ নিজ ডান-হাত ছাড়া কেউ তা জানে না। গোপনে নেওয়া হয় (অধিকাংশ সময়েই প্রয়োজনটা অবশ্য প্রকাশ্য), গোপনে ফেরত দেওয়া হয়। এতে সুদের ব্যাপার নেই। আজ আপনাকে বেনামীতে সেখান থেকেই ম্যানেজ করা হল। চরমতম ক্ষেত্রে এমনও হতে পারে—পাশের ঘরের দিদির বেনামীতে আপনাকে ঠকান হল। অর্থাৎ, টাকাটা ঘর থেকেই বের হল। স-সুদ হলেও মন খারাপ করবেন না। সুদটাও ত সেক্ষেত্রে ঘরেই থাকছে।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায়—পাশের ঘরে অতশত ভালমানুষ থাকে না।

সে ক্ষেত্রে সংসারীদের কোথায় গেলে কি হয়, জানতে হয়। আপনার স্ত্রী তা জানেন। কেননা আপনার অজান্তে উপরের মাসীমাকে নিয়ে ইতিমধ্যেই একবার তিনি সেখান থেকে ঘুরে এসেছেন। এটা প্রকৃতই ব্যবসা। সহায় সম্বলহীন বিধবা—এতেই তার পেট চলে। সুতরাং, খুব চেনাশোনা না হলে তিনি কানেরটা বা গলারটা জামিনস্বরূপ রাখতে চান। তারপরেও টাকায় এক আনা করে সুদ পেতে চান।

একজন নয়, প্রত্যেক পাড়াতেই একজন দু'জন করে তাঁরা আছেন। সকলের প্রয়োজন এক নয়, উদ্দেশ্যও এক নয়। কিন্তু সবাই কিছু না কিছু চান। এবং বলাবাহুল্য কিছু না কিছু পানও। যেমন আসছে মাসে পাবেন আপনার মানে আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে।

কি নাম দেবেন তাঁদের ?

মেয়েরা বলেন—ও বাড়ির মাসিমা। কিংবা—ও-পাড়ার অমুকের মা।

পুরুষেরা বলেন—জেনানা ব্যাঙ্ক।

তবে দরোয়ানজী বলেন, কাবুলীওয়ালা বলেন, আর জেনানা-ব্যাঙ্কই বলেন—মধ্যবিত্ত কেরানীর প্রকৃত ভরসা মধ্যবিত্ত কেরানীই। কথাটা শুনতে হঠাৎ নতুন ঠেকে বটে। কিন্তু পুরানো কথা। অন্তত পঞ্চাশ বছরের পুরানো। তবুও শোনবার মত কাহিনী। সে যেন—কেরানীর কল্পতরু !

যাদের আপিসে আছে তাঁরা বলেন—'রিয়েলি গুড।'

মাসকাবারে হাতটা টান পড়ল, চিন্তার কি আছে ? ফর্ম নাও একটা। শূন্য স্থানগুলো পূর্ণ কর। দু'জন সিকিউরিটি দাঁড় করাও, সই কর, টাকা নাও।

ক্রেডিট সোসাইটির কথা হচ্ছে। কৃত্য কিছু নেই। শুধু মেম্বার হওয়া, মানে দশ টাকার একটি শেয়ার কেনা। তারপর

যখন দরকার, হাত বাড়াও। সুদ মামুলী, মানে শতকরা বার্ষিক ছ'টাকা। কোথাও আর একটু বেশী—সোয়া-ছয় থেকে সাড়ে-সাত টাকা! তা হোক, সময় মত টাকা পাওয়া যায় এবং পাওয়া যায় যত খুশী। অবশ্য সমিতির পকেটের অবস্থা বুঝে। একটা মস্ত সমিতির কথা আমি জানি—যারা মূল মাইনের তিরিশ গুণ পর্যন্ত একবারে দিতে রাজী। মানে দু'শ টাকা যাঁর বেসিক সেলারী, তিনি মেয়ের বিয়ে বাবদে অক্লেশে ছ'হাজার তুলতে পারেন। যদি সে টাকা শোধ হওয়ার আগেই তিনি মারা যান—তা হলেও ভাবনার কিছু নেই। কেরানীদের সমবায়। কেরানী কেরানীর দুঃখ বোঝে। সুতরাং, অনেক সমিতিতেই এক্ষেত্রে নিয়ম—টাকাটা 'রাইট অফ' করে দেওয়া। মানে, হিসেব খাতা থেকে একদম মুছে দেওয়া।

যত শুনি ততই ভাল লাগে। সুতরাং, সবাই এই খবরটা রাখেন কিনা খোঁজ নিতে ইচ্ছে হল। আপিস-পাড়ার খবর—সবাই রাখেন, তবে সবখানে এখনও হয়ে ওঠেনি।

তবুও যতখানি হয়েছে, তাও কম নয়। ১৯৬০ সনের ৩০শে জুন পর্যন্ত পশ্চিম-বাংলায় নানা ধরনের সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে মোট—২১,৯০৬টি। শুনলে অবাক হয়ে যাবেন তার মধ্যে ১৫,৩৬৪টি হচ্ছে ক্রেডিট সোসাইটি বা ঋণদান বিষয়ক সমিতি। এবং তার মধ্যে ৬৪০টিই হচ্ছে নাগরিক।

পশ্চিম-বাংলার শহরে শহরে যত ক্রেডিট সোসাইটি গড়ে উঠেছে তার মধ্যে দুই শ্রেণীর সমিতি আছে। একদল—তারা সমবায় ব্যাঙ্ক, অন্যদল কর্ম্মচারীদের ঋণদান সমিতি। আনন্দের খবর, শেষোক্তটিই এ-ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠ। পশ্চিম-বাংলার সমবায় ব্যাঙ্ক আছে ১৭০টি এবং আপিসে আপিসে কর্মচারীদের ঋণদান সমিতি আছে ৪৭০টি। তার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ রয়েছে এই কলকাতায়। গড়ে তাদের কার্যকর মূলধন সাড়ে চার লক্ষের ওপর।

স্থতরাং, তারা যে শুধু সদস্যদের প্রয়োজন মত ঋণই দেয় তা নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে 'চীপ স্টোর' ইত্যাদির স্থবিধাও দেয়। দু'একটি সমিতি হাউসিং স্কীমও হাতে নিয়েছে। যাঁরা খবর রাখেন, তাঁরা বলেন—এতদ্‌সত্ত্বেও এমন অনেক সমিতি আছে, যাদের হাতে উদ্বৃত্ত মূলধন প্রচুর। তবে শোনা যাচ্ছে, কর্মচারীদের স্বার্থেই তার যাতে ব্যয় হয়—তারও পরিকল্পনা হচ্ছে।

স্থতরাং, কাবুলীওয়ালার ভয়ে পালিয়ে না বেড়িয়ে মধ্যবিত্ত কেরানীর এখন বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবার সময়। কর্তব্যটা, শুধু তাঁদের নয়,—ইউনিয়নগুলোরও। বিবিধ বিষয়ে অনবরত মাথা খাটিয়ে এদিকে যদি তাঁরা আরও একটু মন দেন, তাহলে মানুষগুলো সত্যিই বোধ হয় একটু গাছের তলায় আশ্রয় পায়। এবং কে না জানে যে বৃক্ষ-মূলে বসলে বিনি ঝক্কিতে টাকা ধার করা যায়, নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত কেরানীর কাছে তা-ই কল্পবৃক্ষ। নয় কি?

যাঁরা কলম-নির্ভর নন, সেই অ-কেরানী মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তের কল্পবৃক্ষসমূহ, বলা নিষ্প্রয়োজন, সম্পূর্ণ অন্য চেহারার। এবং আপাতত জেনে রাখুন, সেটি সম্পূর্ণ 'পঞ্চবটী'।

পৃথিবীতে যদি অ-ঋণী আর অ-প্রবাসীরাই একমাত্র সুখী হন, তবে আমরা সানন্দে ঘোষণা করছি—আমরা 'সুখী' নই। এবং সেই সঙ্গে সন্দেহ করছি—বোধহয় এতদ্দেশে অনেকেই তা নন।

আকবর বাদশাহ থেকে হরিপদ কেরানী, মাননীয় ভারত সরকার থেকে নগণ্য বাজার সরকার, মস্ত ব্যবসায়ী থেকে ফুটপাথের দোকানী,—ঋণের প্রয়োজন এবং প্রার্থনা এদেশে সনাতন। 'মহাভারতের' কালে যেমন শাস্ত্রে তার চিন্তা ছিল, কান পাতলে শোনা যাবে আজও মুখে মুখে তার উল্লেখ চলছে। যশ নয়, রূপ নয়,—একালের মানুষের সর্বোত্তম প্রার্থনা যেন আজ, শুধু ঋণ। —ঋণং দেহি!

আশ্চর্য এই, চার্বাকের পরামর্শ অনুযায়ী কেউ তারা ঘৃত-পানের জন্যে 'চোটাওয়ালা'র পিছু পিছু ঘোরে না, 'কিস্তিওয়ালা'র কাছে স্বেচ্ছায় বন্দী থাকে না এবং নিশুতি রাতে গোদ্দারের দরজায় কড়া নাড়ে না। প্রত্যেকের সমূহ কারণ যেমন ভিন্ন, প্রত্যেকের যাচ্ঞাস্থল তেমনি বিভিন্ন। তবে সাকুল্যে তারা দুইটি সম্প্রদায়। উত্তমর্ণ আর অধমর্ণ। এ কাহিনী প্রধানত উত্তমর্ণদের নিয়েই। অগণিত অধমর্ণদের অলিখিত কাহিনীটা এদের ব্যাপ্তি এবং প্রতিষ্ঠা থেকেই অনুমেয়।

হুতোম বলতেন—'চোটাখোর'। ওরা—মানে, ডালহৌসীর পানওয়ালা, বৌবাজারের ওয়ানম্যান (বিড়ি) ফ্যাক্টরীওয়ালা বা এণ্টালী বাজারের রিফিউজি সব্জীওয়ালারা বলে—'চোটাওয়ালা'।

মুখে মুখে চলতে চলতে শব্দটা আজ তাচ্ছিল্যজনক হয়ে উঠেছে বটে, তবে কিন্তু ব্যক্তিটি মোটেই তা নন। যাদের সঙ্গে তার দেখাসাক্ষাৎ লেন-দেন তারা তাকে 'হুজুর' বলে না বটে, কিন্তু 'আপ' বলে, 'জী' বলে এবং হাতে সময় থাকলে এক ছিলিম খৈনি দিয়ে আপ্যায়িত করতেও ভোলে না। কেননা চোটাওয়ালা যার কাছেই 'ট' স্থানে 'থ'ওয়ালা হোক, তাদের কাছে চোটা-ওয়ালাই। সে তার মহাজন। এবং খরিদ্দার যদি প্রভুর সমান হয়, তবে মহাজন নয় কেন?

একদিক থেকে মাননীয় চোটাওয়ালা মহোদয় দরোয়ানজীরই নন-অফিসিয়াল সংস্করণ। সেই চেহারা, সেই ভাষা, সেই অল্প মূলধন এবং বেশী সুদের জমজমাটি কারবার। তবে, দরোয়ানজীর যেমন সেটা সাইড-বিজনেস, তার তা নয়। এটাই তার প্রধান ব্যবসা এবং একমাত্র ব্যবসা। 'চোটা' তার দিবসের কর্ম, রাত্রির স্বপ্ন, জীবনের ধ্যান, জন্মান্তরের কামনা। 'চোটা'ই তার ভূত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ।

লোকটাকে যদি দেখতে চান তবে আপনাকে ভোরের দিকে

কোন বাজারে আসতে হবে, কিংবা সন্ধ্যের দিকে বড় রাস্তার মোড়ে ছোট ছোট পান-বিড়ির দোকানগুলোতে। দেখবেন, একটি লোক অনাবশ্যক একটি দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। জানবেন, এই পনের বা কুড়ি টাকা মূল্যের তরকারী বা পান-বিড়ির দোকানটির আসল মালিক সে-ই। ঘটনাটা চাক্ষুষ বুঝতে হলে দোকানটি লোপ পাওয়া অবধি অপেক্ষা করতে হবে আপনাকে। অর্থাৎ বিক্রিটা শেষ হওয়া অবধি।

বিক্রি শেষ মানে—মূলধনের কাজ শেষ। সুতরাং হাত বাড়িয়ে চোটাওয়ালা তখনকার মত সেটা নিয়ে নেবে। নেবে—সুদটাও। সাধারণত সেটা টাকায় দৈনিক দু' আনা। সেটাই তার আসল—এই এক সকালের উপার্জন।

আসল আর সুদ গুণে দিয়ে যা হাতে রইল (বলা বাহুল্য, অধিকাংশ সময়ে শুধু দাঁড়িপাল্লাটিই থাকে) তা দোকানীর।

ফলে যা হওয়ার একদিন তাই হয়। দিনের পর দিন হাত পেতেও শেষ পর্যন্ত দোকানটি আর রাখা যায় না এবং রাখবার বাসনা থাকলেও মাননীয় চোটাওয়ালাকে সেদিন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। সে স্বর্গের সিঁড়ির সন্ধান পেয়ে গেছে।

'চোটা-ওয়ালা' থেকে 'কিস্তিওয়ালা' ঃ সিঁড়ি না লিফট ?

টাকায় চার আনা সুদ হলে এবং আসল বা সুদের একটি পয়সাও মারা না গেলে পাঁচ সাত বছরের বেশী লাগে না। বাজারের গেট বা দেশওয়ালি দোক্তাপাতাওয়ালার খাটিয়ার কোণ থেকে চোটা-ওয়ালা অনায়াসেই এবার ছোটখাট একখানা ঘরে উঠে যেতে পারে। আজ সে আর 'চোটাওয়ালা' নয়—'কিস্তিওয়ালা'। সাক্ষী গণেশজী, সিঁদুরচর্চিত লৌহসিন্দুক, লাল শালু আর তার চন্দনচর্চিত প্রসন্ন ললাটটি।

কিস্তিওয়ালা মস্ত কারবারী। সে আর দশ-বিশ টাকা লেন-দেন করে না। এখন কমপক্ষে তার হাতে ওঠে একশ, বেশীর

পক্ষে হাজার। তবে একশ বা এক হাজার করে একসঙ্গে সে অনেককে দিয়ে থাকে। কখনও কখনও কয়েক শ'কে। তবে কয়েকটি শর্ত আছে।

প্রথমত টাকা চাইলেই কিস্তিওয়ালা টাকা দেয় না। তাকে একটা কিছু দেখাতে হয়। এবং বলা বাহুল্য আপনি যে সদ্বংশজ তার প্রমাণ স্বরূপ কুলজী কিংবা আপনার চাকুরিটি যে সত্যিই পারমানেণ্ট তার স্বপক্ষে উপরওয়ালার সার্টিফিকেট কিস্তিওয়ালার কাছে একেবারেই অচল। সে আপনার দোকান বা অন্যতর চালু ব্যবসা আছে কিনা, তাই জানতে চায়। যদি তা থাকে তবে সে আর দু'জন দোকানী বা ব্যবসায়ীকে আপনার জামিনদার হিসেবে পেতে চায়।

জামিনদার ঠিক হল। এবার তবে লেখাপড়ার কাজ। যথাসময়ে তার গদীতে আস্থন। একখানা কাগজ সই করতে দেওয়া হবে আপনাকে। সই করুন। জামিনদারদের দিয়েও করান। সকলের সইসাবুদ হয়ে গেলে লোহার সিন্দুকটি খুলবে। এক তাকে জমা পড়বে কাগজটি, অন্য তাক থেকে বের হবে নোটের বাণ্ডিল।

কি, কম মনে হচ্ছে?—হতেই পারে না। কিস্তিওয়ালার অঙ্কে ভুল হয় না। গুণে দেখুন আবার—কত হল? একানব্বই টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা? হ্যাঁ, তাই হবে। একশ টাকার খত লিখে দিলে আপনি তাই পাবেন। টাকায় এক আনা করে 'সেলামী' ধরলে শ' টাকায় কত হয়?—ছ' টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা (সেলামী না অষ্টাঙ্গ প্রণামী?) একশ থেকে সোয়া আট গেল—।

স্থতরাং আর চিন্তা করে লাভ নেই। যা পেয়েছেন তাই নিয়েই এবার উঠে পড়ুন। এদিকে যে সাইকেল এল বলে।

তাই নিয়ম। নয়ত 'কিস্তিওয়ালা' নাম হবে কেন?

সকালে টাকা নিয়েছেন, মানে কিস্তিবন্দী হয়েছেন। বিকেল থেকেই সুরু হবে আপনাকে ছাড়ানোর চেষ্টা।

বিকেলে কিস্তিওয়ালার লোক আসবে সাইকেল চড়ে। এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে তার হাতে আজকের কিস্তিটি দিয়ে দেওয়া চাই। একশ টাকা নিয়েছেন ত ? তবে সুদ সহ আপনাকে দিতে হবে দিনে একশটি পয়সা। পুরানো পয়সা। কোথায় পাবেন ? তবে নয়া পয়সাই দিন। একশ পুরানো পয়সা সমান নতুন এক টাকা ছাপ্পান্ন নয়া পয়সা। হ্যাঁ, তাই দিতে হবে।

একদিন নয়, দু'দিন নয়, বাহাত্তর দিন দিতে হবে। মানে দু' মাস বারো দিন। তবে আপনার বন্দীদশার শেষ ; হিসেব কষলে দেখবেন তাতে খরচ পড়েছে একানব্বুই টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা বাবদে মোট একশ বারো টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা। বাড়তি টাকার সবটাই অবশ্য কিস্তিওয়ালার মুনাফা নয়। তাকেও আবার সাইকেলওয়ালার মাইনে দিতে হয়। তবে শুধু আপনার বাবদেই নয়, একজন সাইকেলওয়ালার হাতে থাকে কম করেও পঞ্চাশজন বন্দী। অবশ্য মাইনে তাদের সে তুলনায় খুবই কম। গড়ে তিরিশ কি পঁয়ত্রিশ টাকা। তবে কেউ কেউ তাদের কমিশনও দিয়ে থাকেন একটা। তার পরিমাণ—খাতকওয়ারী মাথা পিছু দু'টাকা। অর্থাৎ যে সাইকেলওয়ালার হাতে পঞ্চাশ-জন খাতক, মাসে তার আয় একশ-পঁয়ত্রিশ টাকা। তাকে আরও বেশী দিলে কিস্তিওয়ালা অবশ্য মারা পড়বে না, কিন্তু বেচারার উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলো তাহলে মারা যায়। কিস্তিওয়ালার পরেই সুবর্ণসিঁড়ির তৃতীয় ধাপ,—হুণ্ডিওয়ালা।

'হুণ্ডিওয়ালা' দু-রকমের হতে পারে। প্রথমত জগতের সূচনা-দিনে ঈশ্বর নিজের হাতে তাদের সৃষ্টি করতে পারেন। দ্বিতীয়ত, কিস্তিওয়ালা থেকে তারা হুণ্ডিওয়ালায় প্রমোশন পেতে পারে। প্রথম দলটি নাকি বাইবেলের যুগ থেকেই পৃথিবীতে আছে।

ইউরোপ এবং মধ্য-এশিয়ায় তারা ইহুদি-সম্প্রদায়ভুক্ত এবং ভারতে 'মূলতানী হুণ্ডিওয়ালা' নামে খ্যাত।

মূলতানী হুণ্ডির বৈশিষ্ট্য, সেটা শুধু সিন্ধুপ্রদেশেই চলে না—তাবৎ দুনিয়ায় নাকি স্বচ্ছন্দে চলে ফিরে বেড়ায়। পৃথিবীর না হলেও দেশের প্রায় সব বড় বড় ব্যাঙ্কই তাদের চেনে। এবং তারাও দেশের যে কোন উল্লেখযোগ্য ফার্মের নাড়িনক্ষত্র জানে।

অভিজ্ঞেরা বলেন—ঘটনাটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। ধরা যাক, কোন হুণ্ডিওয়ালার কাছে আপনি দশ হাজার টাকা ধার চেয়েছেন। কিস্তিওয়ালা হয়ত একদিনের মধ্যেই 'হ্যাঁ' বা 'না' বলে দেবে। কিন্তু হুণ্ডিওয়ালা সময় চাইবে কমপক্ষে সাত দিন ; দরকার হলে—এক মাস।

এই সময়টার মধ্যে তৈরী হবে পার্টির কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট। আপনি কেমন লোক, আপনার ফ্যামেলি কেমন, ব্যবসার অবস্থা কি, ভবিষ্যত কি, ব্যাঙ্ক-রেকর্ড কেমন—সব মিলিয়ে সে রিপোর্ট নাকি গোয়েন্দা বিভাগকেও হার মানায়।

যদি দেখা গেল আপনার বিরুদ্ধে তেমন কিছু নেই, তবে টাকা মঞ্জুর হয়ে গেল। তবে তার আগে কিছু কৃত্য আছে।

প্রথমত আপনাকে একজন উপযুক্ত গ্যারাণ্টার জোগাড় করতে হবে। এমন লোক, হুণ্ডিওয়ালা যাকে বিশ্বাস করে।

তারপর গদি কিংবা আপিসে আসুন। ফর্মে সই করুন। ফর্মটাকে বলে—'সোলা অব এক্সচেঞ্জ।' হুণ্ডিওয়ালা কিস্তিওয়ালার মত 'প্রণামী' দাবি করে না। কিন্তু তাতে সে কিছু হারায় না।

যে ব্যবসার যে রীতি। নিয়ম হচ্ছে একজন মধ্যস্থ মানে দালাল থাকা চাই, লেন-দেন বাবদে স্বভাবতই তারও একটা প্রাপ্য দাঁড়ায়। সাধারণত তার পরিমাণ শতকরা ½ টাকা! হাজার হাজার টাকার কারবারে তা-ই বা মন্দ কি!

হুণ্ডির আর একটা নিয়ম—শোধের বেলায় তাতে কোন

'গ্রেস পিরিয়ড' নেই। সাধারণত মেয়াদ—নব্বুই দিন এবং সুদের পরিমাণ ঘটনা বুঝে এবং সময় অনুযায়ী শতকরা ছ'টাকা থেকে সাড়ে-বার টাকা। তবে যথাসময়ে শোধ করা চাই। নয়ত সঙ্গে সঙ্গে ডিক্রি। আপনার নাম কাল-খাতায় উঠল, জামানতদারের (যা খুশী) জরিমানা হল—এবং ব্যবসা-জগতে চিরকালের মত আপনার ক্রেডিট গেল।

হুণ্ডি-ক্রেডিটের ওপর ক্রেডিটের ব্যবসা।

সুতরাং, সাবধান। একানব্বুইতম দিনটির জন্যে বসে থাকবেন না। যেদিন যাওয়ার কথা, খালি হাতে হলেও (অবশ্য জামানতদার সহ) হাজিরা দিন এবং খতটাকে নতুন করে লিখিয়ে নিন। তেমন ভাবে ধরতে পারলে হুণ্ডিওয়ালা তাতেও রাজী। কেননা, হুণ্ডি যেমন ক্রেডিটের কারবার, তেমনি সুদেরও। সুদের উপর সুদ তস্য সুদ। হুণ্ডিওয়ালার কাছে জগৎ সুদ তথা —সুধাময়, খাতকেরা সব—সুধাকর।

মর্টগেজওয়ালা আরও সুখী মানুষ। সাবেকী দিন আর নেই বটে, কিন্তু 'নাই-নাই' করেও ব্যবসাটা ঠিক আগেকার মতই আছে। দেশে বহু ব্যাঙ্ক হয়ে গেছে, বড়মানুষের বড়মানুষি মোটা-মুটি একটা বাঁধাধরা ফর্দে এসে গেছে—কিন্তু বন্ধকী কারবারটি যে-কে-সেই আছে।

পুরানো জমিদারেরা সোনাদানা রেখে টাকা চান, পেট্রোল খরচ বাবদে নব্য বড়মানুষেরা ইনসিওরেন্সের কাগজ রেখে চান এবং মেয়ের বিয়ের অজুহাতে এককালের বনেদী ঘর অনায়াসেই একখানা আস্ত বাড়ী কিছুকালের মত ওদের হাতে রেখে যেতে চান। সুবিধে, যদিও দলিলপত্র বিশেষ কিছু নেই (রেজিস্টার্ড কারবারীদের কথা হচ্ছে না) তবুও কাকপক্ষীটি টের পাবে না।

অসুবিধে, যেদিন টের পাবে—সেদিন শ্বশুর, সম্পন্ন ব্যক্তি

হলেও 'মেয়ের জন্যে' আর কিছু করার অবসর পাবেন না। কেননা, মেয়াদ পার হয়ে গেছে। বন্ধকী কারবারে মেয়াদই হচ্ছে সবচেয়ে জরুরী কথা। অবশ্য বন্ধক যিনি রাখেন, তাঁর পক্ষে সবই জরুরী।

প্রথমত, তাঁকে বিষয়টি সম্পর্কে গোড়ার দিকে রীতিমত অনিচ্ছা দেখাতে হবে। ফলে—ভ্যালুয়েশন কমবে। তারপর কিছুক্ষণ বা কিছুদিন ধৈর্য ধরে দরদাম চালাতে হবে। ফলে—একশ টাকার জিনিষ রেখে তাকে পঁচাত্তর টাকা না দিলেই চলবে। খাতক পঞ্চাশ পেয়েই 'জিতে গেলাম' বলে ভাববে। যদি মনে হয়, লোকটি বাস্তবিকই সম্পন্ন, উপস্থিত বেকায়দায় পড়েছে মাত্র, তবে সুদের হারটা অস্বাভাবিক রকম বাড়িয়ে পরিশোধের মেয়াদটা সেই পরিমাণে কমিয়ে ফেলতে হবে। তাতে বস্তুটি হাতে থাকবে। না থাকলেও, আপশোসের কারণ থাকবে না। বন্ধকী কারবারে তার সুযোগ নেই। কেননা, পৃথিবীতে এটাই একমাত্র ব্যবসা যেখানে দৈব-ঘটিত কারণ ভিন্ন কদাপি লোকসানের সম্ভাবনা নেই। তবুও সাবধানে চলতে হয়। জমি বাড়ী হলে কাগজপত্রগুলো দেখেশুনে নিতে হয়। এবং সোনাদানা হলে—অবশ্যই চারটের আগে। তারপর আলো কমে যাবে এবং পাকা জহুরীর চোখেও হয়ত নকল অবিকল আসল ঠেকবে। সুতরাং যা করেন চারটের আগে। শীতকাল হলে সাড়ে-তিনটার মধ্যে।

উপসংহারে আমাদের পাড়ার চব্বিশ ঘণ্টা-হাসিমুখ মানুষটির কথা না বললে বাস্তবিকই অকৃতজ্ঞের কাজ হবে।

সন্ধ্যার পরে এক জোড়া কানবালা নিয়ে তাঁর ঘরে যান। দেখবেন, তিনি কখনো বলবেন না—'এই তিন সন্ধ্যায় এলে?' বরং উল্টো—মুখে হাসি মেখে বলবেন—'কত চাই?—আবার টান পড়ল বুঝি?'

বাঁধা বরাদ্দ, বাঁধা সুদ। ছ'আনা সোনার বাবদে পাবেন

আপনি—পনের টাকা। আর সুদ বাবদে দিতে হবে আপনাকে মাসে—এক টাকা (কি হারে, পোদ্দার কোনদিন তা বলেন না)।

জিনিষটা হাতে দিন,—টাকা নিন। কয়েক মিনিটের মামলা। বুড়ো একবার নেড়েচেড়েও দেখবে না জিনিষটা। কেননা, ওটা তারই হাতে তৈরী এবং তৈরী হওয়ার পর থেকে প্রতি মাসে না হলেও দু' মাস অন্তর একবার করেও বটে—তার সিন্দুকে হাজিরা দিয়ে যাচ্ছে। দেখে দেখে কারিগরের চুল পেকেছে। সে জানে—এখন মহলা চলছে। কানবালা আর সিন্দুকে কানাকানি। অচিরেই এমন দিন আসছে যেদিন কিছুতেই ও-জিনিষ আর ওখান থেকে বের হবে না।

তবে হ্যাঁ, হৃদয় আছে মানুষটার। সোনা-কারিগর বটে, কিন্তু তার যে সোনা না হলে চলবে না—এমন আব্দার নেই। সোনা, রূপা, পিতল, কাঁসা, তামা—যা তোমার খুশী। এবং সকাল, সন্ধ্যা, রাত্রি, মাঝরাত্রি যখন তোমার অভিলাষ।

'—কি আনলে ?—ঘড়ি ?—ঘড়িটা আজকাল সস্তা যাচ্ছে'—

'—কি ? —ক্যামেরা ? —দিশি না বিদেশী ?'

'—শাল ? কোনটা, সেই যেটা বিয়ের সময় পেয়েছিলে, না কর্তা যেটা নিজে কিনে দিয়েছিলেন—?'

মামুলী জিজ্ঞাসা। এই একটু যাচাই করে নেওয়া। নয়ত রেট সব এক। দাম—তার আনুমানিক দামের (যা অবশ্যই আসল দামের হাফ) হাফ, সুদ—তঙ্কাপ্রতি মাসে ছ' আনা থেকে চার আনা, মেয়াদ—এক সপ্তাহ থেকে এক মাস, দু' মাস। বড় জোর তিন মাস।

জানি, তৎসত্ত্বেও আপনি আপত্তি করবেন না। কেউ করে না। কেননা অধমর্ণের মুখে তা শোভা পায় না। কারণ, যে যতই বলুক কোন দিন তারা ঘি খাওয়ার জন্যে ঋণ করে না।